রক্ত ঝরছে আরাকানে



মাওঃ আতিক উল্যাহ্ জুলফিকার

রক্ত ঝরছে আরাকানে

সংকলনে
মাওলানা আতিক উল্লাহ জুল্‌ফিকার

আল্‌-নূর পাবলিকেশন্স
চট্টগ্রাম ।

রক্ত ঝরছে আরাকানে

সংকলনে
মাওলানা আতিক উল্লাহ জুলফিকার

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯৬ইং।
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ইং।
তৃতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০০ইং।

মূল্যঃ- ১২.০০ টাকা (বার টাকা মাত্র)

Rakta Jharcha Arakane: by-Maulana Atik-Ullah Julfiqar.
3-rd eddition september 2000.
Price- Tk. 12:00 only.
Published by-All Nur Publications,

লেখকের আরজ

মুহতারম পাঠক !

আমাদের কারো অজানা নয় যে, আজ সামগ্রীকভাবে বিশ্ব ব্যাপি মুসলমানগন ইহুদী নাছারা তথা কাফের কর্তৃক বিভিন্নমুখী নির্যাতনের শিকার। মজলুম মুসলমানদের আর্তনাদের আহাজারী যত-কিঞ্চিত কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া সহ কিছু এলাকার খবরা-খবর মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমে আসলেও আরাকানের মত অনেক নির্যাতিত মুসলমানদের আহাজারী আমাদের পর্যন্ত তেমন আসছেনা।

আফসোস আর পরিতাপের বিষয় হলো আরাকান বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত। আরাকানীরা বাংলাদেশীদের চেহারা সুরতে ভাষার দিক দিয়ে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এবং প্রতিদিনকার জুলুমের বার্তা-সীমান্ত এলাকা গুলোতে পৌঁছলেও কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পৌছেনি, এখনো না। এই মজলুমদের ফরিয়াদ! মানবতার দরবারে পৌছানোর গুরুত্ব অনুধাবন করে গত দু'বছর পূর্বে সংক্ষিপ্ত আকারে ছেপে ছিলাম। সাহিত্যের মান দুর্বল থাকলেও মজলুম মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পাওয়ায় পাঠক মহলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিছু দিন যেতে না যেতেই ২য় সংস্করন ছাপাতে বাধ্য হই। দেশ-বিদেশের ভাই, বন্ধু-বান্ধবদের পিড়া-পিড়িতে বিভিন্ন ব্যস্ততা ও পেরেশানীর মাঝে ও পরিবর্ধিত সংস্করন পাঠক মহলে পেশ করলাম।

এই আর্তনাদ বার্তা পাঠন্তে মজলুম অসহায় মুসলমানদের মুক্তির জন্য জানমাল দিয়ে এগিয়ে আসলেই আমার চেষ্টা স্বার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

নতুন সংস্করনে ভাই মাওঃ নিজাম উদ্দিনের নিস্বার্থ ও আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি চির কৃতজ্ঞ।

মোঃ আতিক উল্লাহ জুলফিকার
২৫-০৮-২০০০ইং

আরাকান ও রোহিঙ্গা মুসলিম

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান। সাগর ও পাহাড় ঘেরা একটি অত্যন্ত সুন্দর দেশ। পূর্বদিকে সুউচ্চ ও বিশাল পাহাড়ের মাধ্যমে এটি বার্মার মূল ভূখন্ড থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে আছে। ৩৬.৭২৬ কিঃমিঃ জুড়ে এর আয়তন। বাংলাদেশের সাথে জলে ও স্থলে রয়েছে ১৭৬ মাইলের মত সিমান্ত। নাফ নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে রাজনৈতিক সীমারেখায় বিভক্ত বিভিন্ন নদ-নদী ও বনাঞ্চল ঘেরা সবুজ শ্যামল এদেশটি প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আরাকানে পৃথিবী খ্যাত সেগুন কাঠের কথা কে না জানে? আরাকানে প্রচুর ফলনশীল উন্নতমানের কাঠ ও চাল এর বিশ্ববাজারে খুব চাহিদা রয়েছে। আরাকানের রাজধানী আকিয়াব চাল রফতানীর জন্য একটি অত্যন্ত জমজমাট বন্দর। সেখানে সব সময় ভীড় লেগেই থাকে। ইতিহাসে আরাকান 'ধান্যাগার' নামে খ্যাত যার প্রাচীন নাম হচ্ছে ধান্যবতী। এক সময় রোহাং নামে পরিচিত আরাকান একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। আরাকান রোহিঙ্গা নামে খ্যাত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ কালের আবাস ভূমি। আরাকানের দীর্ঘকালের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে রয়েছে তাদের গভীর সম্পর্ক। হিজরী ১ম শতাব্দী অর্থাৎ ইসায়ী ৭ম শতক থেকেই আরব বনিকদের সংস্পর্শে এসে এখানকার জনগোষ্ঠী মহান ইসলামের সুন্দর ও সুশীতল পরশ লাভ করে আরাকানে ৪০লক্ষ মুসলমানদের জন্য। শতকরা ৭০ভাগ রোহিঙ্গা মুসলিম এবং ৩০ ভাগ অমুসলিম অধ্যূষিত আরাকান ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ ছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে আরাকানে বিভিন্ন বংশীয় রাজত্ব স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেন। আদিকাল থেকে এখানে রোহিঙ্গা মুসলমান ও মঘী বৌদ্ধ সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

করে আসছেন। ১৪৩০ ইসায়ী সনে আরাকানে বৌদ্ধ রাজার ইসলাম গ্রহনের মাধ্যমে এখানে স্বাধীন ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর আরাকানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামের সুদীর্ঘ সুশীতল ছায়ায় আরাকানে গড়ে উঠেছিল একটি উন্নত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যা রোহিঙ্গা সংস্কৃতি নামে খ্যাত। রোহিঙ্গা মুসলমান জাতিই ছিল মূলতঃ এ সভ্যতার ধারক ও বাহক। আরাকান রাজ্যসভার কবি আলাউল থেকে শুরু করে আরও অনেক মুসলমান কবি, সাহিত্যিক পীর, আউলিয়া ও বুজর্গ আরাকানে জন্মগ্রহণ করেন। একটি শান্তি ও সুখময় জীবনের প্রতিচ্ছবি ছিল আরাকান। সেখানে ছিলনা কোন সাম্প্রদায়িকতা। শাসনের শেষ পর্যায়ে আরাকান রাজপ্রাসাদে অন্তর্বিবাদ ও কলহের সুযোগে বর্মী বৌদ্ধ রাজা বোদাপায়া ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আরাকান আক্রমন করে দখল করে নেয়। আরাকানে বর্মী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মুসলমান ও মঘী বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের উপর শুরু হয় জুলুম, মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত এক ভূখন্ডের নাম হয় আরাকান। জালিমের মানবতা লুষ্ঠনের এক শিকারভূমি আরাকান, শোষণ আর দুঃশাসনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে মজলুম মুসলমানকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার এক বধ্যভূমি বার্মার কুক্ষিগত এই আরাকান।

বর্মী নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের সবচেয়ে বেশী শিকার হয় মুসলমানগণ। কারণ রেহিঙ্গা মুসলমানরাই ছিল একটি স৺ ত ন্ত্র সভ্যতা ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারক।

আরাকান থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্মূল ও ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিশ্চিন্ন করার এহেন বর্ণবাদী অপকৌশল সত্বেও তারা সফলকাম হতে পারেনি। রোহিঙ্গাগণ যে একটি দৃঢ় জাতি হিসেবে হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে আরাকানে বসবাস করছে এবং আরাকান যে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী একটি ইসলামী রাষ্ট্র ছিল, তা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত অভিযান আজও অব্যাহত রয়েছে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করার সকল অপচেষ্টা চলছে।

আরাকানে মুসলিম নির্যাতন

রোহিঙ্গাদের এ সুখ কেড়ে নেয়া হয়, বারবার শুরু হয় নির্যাতন। ১৭৮৪ সালে বর্ণবাদী বর্মী বৌদ্ধ রাজা বোদাপায়া আরাকান আক্রমন ও দখল করে। আরাকান থেকে মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও বিতাড়নের মহা-পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নেমে আসে নির্যাতনের ষ্টীমরোলার। বর্মী মঘদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতায় উস্কিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে, এবং একসময় নিগৃহিত হয়ে কয়েক লাখ মুসলমান বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেয়। অনেক মসজিদ-মাদ্রাসা বর্মী রাজা ধ্বংশ করে দেয়। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ, বার্মা আলাদা হওয়ার পর বার্মায় (Home Rule) বিষয় অনুমোদন করলে বার্মায় পুরোপুরি বর্মী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় বর্মী শাসকরা বার্মার বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। ফলে ১৯৩৮ সালে বার্মা প্রপার ও নীচু অংশে (Lower Burma) ত্রিশ হাজারেরও বেশী মুসলমান নিহত হয়।

১৯৪২ সালে বৃটিশ যখন আরাকান থেকে চলে আসে এবং জাপানীরা সবেমাত্র বার্মায় প্রবেশ করে তখন প্রশাসনিক শূন্যতার সুযোগে মঘী বৌদ্ধ বর্মীদের সরবারহকৃত মরণাস্ত্র দিয়ে এক লাখেরও বেশী মুসলমানকে নৃসংশভাবে হত্যা করে এবং পাঁচ লাখেরও বেশী মুসলমান প্রাণভয়ে দেশ ত্যাগ করে।

১৯৪৭ সালে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের আরাকান থেকে বিতাড়নের জন্য বর্মী শাসকবর্গ পরিকল্পিত গণহত্যা ও নিপীড়নের নতুন অভিযান শুরু করে। মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর এলাকাকে কালো এলাকা (Black Area) ঘোষণা করা হয়। এ সময় শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর জন্যে বার্মা টেরিটেরিয়াল ফোর্স (BTF) গঠন করা হয়। এরা আরাকানে অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালায়। বি.টি.এফ. মুসলিম গ্রাম ও ঘর-বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়,

হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। এসময় গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে ত্রিশ হাজার মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।

১৯৪৮ সাল থেকে ইমিগ্রেশন এক্টের অধীনে তদন্তের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপারেশন চালানো হয়। ১৯৭৮ সালে পরিচালিত নাগামিন ড্রাগণ অপারেশন নজিরবিহীন পাশবিকতার সাক্ষী বহন করে। এ অপারেশনে মুসলিম এলাকাগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। দশ হাজারেরও অধিক লোককে হত্যা করা হয় এবং বাধ্যতামূলক বিতাড়নের ফলে তিন লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়, যাদের মধ্য থেকে পয়তাল্লিশ হাজার শিশু ও বৃদ্ধ উদ্বাস্ত ক্যাম্পে মারা যায়।

১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের সাথে কঠোর বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক আইন করা হয় এবং সামরিক সরকারের দমন নীতি অনুসারে মুসলমান শিক্ষিত, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদেরকে জেলে ঢুকানো হয় অথবা গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়াও বর্তমানে রোহিঙ্গাদের উপর বাধ্যতামূলক শ্রম ও মা-বোনদের সম্ভ্রম হানিসহ বিভিন্ন অমানবিক জুলুম অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯১ সালে বর্মী সামরিক জান্তা (Slorc) বাহিনীর বর্বরতার শিকার হয়ে লাশ হয়েছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা, ইজ্জত হারিয়েছে অসংখ্য মা-বোনেরা, নিগৃহীত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে তিনলাখ রোহিঙ্গা মুসলমান। পঞ্চাশ হাজর উদ্বাস্তু এখনও কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত (Refuges Camp) এলাকাগুলোতে খোলা আকাশের নীচে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এভাবে বর্মীজান্তার তথাকথিত বিভিন্ন অপরেশনে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা অঘোষিত (Refuges) হিসেবে বসবাস করছে। এসব ঘৃণ্য পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের হয় ইসলাম ত্যাগ নতুবা বার্মা ত্যাগে বাধ্য করে আসছে। নীচে অমানষিক অত্যাচারের একটা চিত্র তুলে ধরা গেল।

সামাজিক বৈষম্য

এক ঃ রোহিঙ্গা মুসলমানগণ তাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য এখনো সংগঠিত কোন উদ্যেগ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেনা। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়, যাতে অন্য দেশের লোকেরা তাদের ঘৃণার চোখে দেখে।

দুই ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক দাঙ্গা সব সময় লাগিয়েই রাখা হয়েছে। ফলে তাদের জীবন ও সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য কর্তৃপক্ষ কখনো কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

তিন ঃ বার্মার সৈন্য ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য সারা বছরই চাল, ডাল, মুরগী, ছাগল, কাঠ এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করতে বাধ্য করা হয়।

পাঁচ ঃ রোহিঙ্গা মহিলাদের তাদের ঐতিহ্যমন্ডিত বোরখা পরতে নিষেধ করা হচ্ছে। (Slorc) বাহিনীর পাশবিক লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য রোহিঙ্গা যুবতীদের জোর পূর্বক ধরে নিয়ে বিভিন্ন কাজের মিথ্যা অজুহাতে ৬ মাস ধরে ক্যাম্পে রাখা হয়। পরিশেষে এরা ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। এভাবে বহু মহিলাকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে।

ছয় ঃ রোহিঙ্গাদের কুলি কাজে এবং রাস্তা, বাধ ও বিল্ডিং নির্মানে বিনা মজুরিতে বাধ্যতামূলক শ্রম দানে বাধ্য করা হয়। যদি পুরুষদের বাড়ীতে পাওয়া না যায় তবে মহিলাদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। এসময় শ্রমিকদের খাবারও দেয়া হয় না। নিজের খাবার নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হয় অথবা উপোস থাকতে হয়।

সাত ঃ আরাকানের মুসলমানদের নিজ দেশের ভেতরে অবাধে যাতায়াতের স্বাধীনতা নেই, যা মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। এমনকি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে অনুমতি লাগে, যা কিন্তু সহজলভ্য নয়। অনুমোদন নিয়ে গেলেও যার কাছে গেছে তারও আবার অনুমোদন দরকার হয়।

আট ঃ মুসলমান ছাত্ররা প্রায়ই তাদের সহপাঠীদের দ্বারা দৈহিকভাবে আক্রান্ত হয়, যে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন সু পদক্ষেপ নেই।

নয় ঃ মুসলমানদের সংখ্যালঘু করার উদ্দেশ্যে মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে অমুসলিমদের পুনর্বাসন করা হয়।

দশ ঃ বর্মী বাহিনী তাদের উচ্ছেদ তৎপরতা সহজ করার জন্য প্রলোভন দেখিয়ে এক শ্রেণীর বিশ্বাস ঘাতক রোহিঙ্গাদের দ্বারা রাহবেটা নামে এক মুনাফেকী বাহিনী গঠন করেছে। এই তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী মুনাফিকরা স্বজাতীর উপর যে জঘন্যতম অত্যাচার চালাচ্ছে তা বর্মী সৈন্যদের পৈশাচিকতাকেও হার মানিয়েছে এরা সৈন্যদের পথ দেখায়, যুবক যুবতীদের ধরিয়ে দেয়, রোহিঙ্গাদের ধনসম্পত্তি লুট করে এবং তাদের জোর করে বাড়ী ঘর থেকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দিতে মদদ জোগায়।

এগার ঃ আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা মংডু, বুচিদং, আকিয়াব, কইউক পাড়া টংগুপ পাড়া চেদুক প্রভৃতি টাউনশীপে উগ্র মগদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য সেনা অফিসাররা উসকানী দিচ্ছে বিভিন্নভাবে। তারা আরাকানের সকল সক্ষম মগ নারী পুরষদের বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বর্মী মগদের ট্রেনিং করানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা টেকনাফ কক্সবাজার সহ পার্বত্য এলাকার মগ, চাকমাদের ও বিশেষ সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে বার্মা সরকার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। যেন তাদের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সহজ হয়।

হে মুসলিম রক্ত বহনকারী ঈমানদারগন, হে ইসলামের বীর সৈনিকেরা, হে তারিক, খালিদ, সালাউদ্দীন, কাসিমের উত্তরসূরীরা! তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না লক্ষ লক্ষ স্বজন হারা, স্বাধীনতা, স্বদেশ ও গৃহহারা রোহিঙ্গা মুসলমানের বুক ফাটা আর্তনাদ? দেখছনা কিভাবে হিটলারের নব সংস্করণ মুসলিম রক্তপিপাসু জালিমের দল চালিয়ে যাচ্ছে মানবতা ধ্বংসের তান্ডব, ওদের

পৈশাচিক অট্টহাসিতে কেপে উঠছে আকাশ বাতাস? বনের জানোয়ারও ওদের হায়েনার মত হিংস্র মুখ দেখে লজ্জায় মুখ লুকায়। আর কত দেখতে চাও মুসলিম এই অপরাধে রোহিঙ্গা মুসলমানের রক্তের বন্যা, উজাড় করা মুসলিম জনপদ? আর কত শুনতে চাও ভেসে আসা লাখো ধর্ষীতা মা-বোনের কান্না, অবোধ শিশুর হাহাকার? ওদের কান্নার চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে আকাশে, বাতাসে; ফুসে উঠছে নদীর পানি। তোমরা আর কতকাল কালক্ষেপন করবে? যে জাতির সৈনিকরা ডান হাত কেটে গেলে বাম হাতে, বাম হাত কেটে গেলে দুপায়ে, দুপা কেটে গেলে মুখে কামড়িয়ে সত্যের পাতাকা উড্ডীন রাখে, তবুও পতাকা ভুলণ্ঠিত হতে দেয় না, যে সত্যের সৈনিকেরা মানবতাকে রক্ষা করতে, জালিমকে উৎখাত করতে এবং সত্যকে "অন্ধ" জাতির কাছে তুলে দিতে, বিপদ সংকুল হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সকল প্রকার জালিম এবং বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যে জাতির মুল শিক্ষা; সেই সর্বোত্তম জাতির রক্তের অধিকারী হয়ে সেই পথের পথিকদের উত্তরসূরী হয়ে আর কতকাল নীরবে আরাকানের মুসলমানদের ঘরে ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখবে? আর কত মানুষ আমাদের অবহেলায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাবে তীলে তীলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে? দেখতেই থাকব জালিমের হাতে নিষ্পেষিত মুসলিম শিশু, যুবক, যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার লাশ?

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে নিজেকে মুসলমান দাবী করি তাহলে আর কালবিলম্ব নয়। চল সমস্ত বিলাস ব্যসন যা এতদিন একবিন্দু শক্তি সাহস যোগাতে পারেনি ছুরে ফেলে দিয়ে জুলফিকার হাতে নিয়ে ছুটে যাই ময়দানে, হায়দারী হুঙ্কার ছেড়ে চমকে দেই দানব শয়তানকে, ধ্বংস করি মানবতা ধ্বংসে উদ্দ্যত উম্মাদকে, প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে ছাই করে দেই জালিমের জনপদ, শুনিয়ে দেই জালিমকে জিহাদের প্রলয়ংকারী ডঙ্কা, উৎখাত করে নির্বাসিত করি তখ্‌তে তাউসহ নব্য হিটলার সওমংদের বঙ্গোপসাগরের অতল তলে। আল্লাহ্ তুমি আমাদের সেই তৌফিক, শক্তি ও সাহস দাও।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা ওশোষণ

এক ঃ ১৯৮৭ সালে মুদ্রা বিলোপের ফলে চাল ব্যবসায়ীরা কিয়াটের ওপর আস্তা হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা আভ্যন্তরীণ বাজারে চাল বিক্রির পরিবর্তে বিদেশে রপ্তানী করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং অনেক চাল ও খাদ্যসামগ্রী চোরাই পথে বিদেশে পাচার হয়ে যায়। ফলে আব্যন্তরীণ বাজারে চালের ঘাটতি দেখা দে। অন্যদিকে সরকারী গুদামগুলো বন্ধ রাখা হয়। বাজরে চালের সরবরাহ না থাকায় সামরিক জান্তা ক্ষমতায় আসার পর চালের দাম কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক অঞ্চল বিশেষত আরাকানে চরম খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং শত শত রোহিঙ্গা মুসলমান চরম খাদ্যাভাবের কারণে অনাহারে মারা যায়।

দুই ঃ মুসলমানদের জমিগুলো কাল্পনিক অজুহাতে বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সেখানে অমুসলিমদের পূনর্বাসিত করা হয়। মুসলমানদের চিংড়ি চাষের প্রকল্পগুলো কোন কারণ ব্যতিরেকেই বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তিন ঃ সরকারী কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের নিকট থেকে তাদের সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য জোর করে সীজ করে নেয়। যারা সরকারের দাবী অনুসারে দিতে পারে না তাদের জমি রাষ্ট্র কর্তৃক দখল করে নয়া হয়। এমন বর্বর আইন শুধু রোহিঙ্গাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। মুসলমানগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে না। ছোট বা ক্ষুদ্র দোকানগুলো প্রায়ই লুট করা হয় এবং রোহিঙ্গা জাতিকে উদ্ধারের জন্য বিগত দিনগুলোতে বার্মার আধিপত্য ও বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিদ্রোহ করার জন্য অথবা নির্যাতনে অসহ্য হয়ে অসংখ্য রোহিঙ্গা বার বার হিজরত করেন।

ধর্মীয় নির্যাতন

এক ঃ বর্মী শাসকদের ঐতিহাসিক ধর্মীয় বিদ্বেষ অনুযায়ী সমং নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ও আরাকান থেকে ইসলামী ঐতিহ্য মুছে ফেলার অশুভ প্রয়াস চালিযে যায়। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে বুচিদং টাউনসিপের শ্লর্ক প্রশাসক কর্নেল পেটিং বুচিদং টাউনের পাঁচ একর বিশিষ্ট শতাব্দী প্রাচীন কবরস্থানটি বাজেয়াপ্ত করার নোটিশ জারি করে এবং মুসলমানদের উক্ত কবরস্থানে মুর্দা দাফন না করার জন্য কড়া নোটিশ জারি করা হয়। সমং শাসনামলে মুংডুর একটি কবরস্থানও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সমং নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের ধর্মীয় বিদ্বেষও এত চরমে পৌচেছে যে, তা থেকে মসজিদটিও রেহাই পায়নি। প্রশাসন প্রথমে মসজিদটি ভাঙ্গার জন্য স্থানীয় মুসলমানদের ধরে নিয়ে আসে। তার অস্বীকার করলে জেল থেকে মগ ও মুসলমান কয়েদীদের এনে মসজিদটি ভাঙতে বাধ্য করা হয়।

দুই ঃ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি এবং কবরস্থানগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অমমুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়।

তিন ঃ সৈন্যরা প্রায়ই জুতা পায়ে মসজিদ ও মাদ্রাসায় প্রবেশ করে এবং সেখানে তারা মদ্যপান করে। তারা মসজিদ কম্পাউন্ডে থুথু, পাথর ও ময়লা নিক্ষেপ করে এমনকি তারা মসজিদে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরী করে কম্পাউন্ডে পেশাব পায়খানাও করে থাকে।

চার ঃ প্রকাশ থাকে, মুসলমানরা কোরবানী করতে হলে প্রত্যেক গরুর পেছনে পাঁচশত টাকা জরিমানা দিতে হয়। কোন মুসলমান শিশু জন্ম নিলে পাঁচশত টাকা সৈন্যদের দিতে হয় এবং কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলেও পাঁচশত টাকা সামরিক জান্তাকে দিতে হয়। এমনটি একটা মুরগী জবাইয়ের জন্য পাঁচ টাকা দিতে হয়।

পাঁচ ঃ ধর্মীয় মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রায়ই ভীতি প্রদর্শন ও আক্রমন করা হয়। শিবিরে কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয় এবং তাদের নানাভাবে অপদস্থ করা হয়। লাউড স্পীকার দিয়ে আজান দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ছয় ঃ আরাকানের বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব ভেঙ্গে জাদী বানানো

হয়। মংডুর দক্ষিণে চাপকুম্বার জামে মসজিদ তার জলন্ত প্রমাণ। এভাবে বর্মী জানতা আরাকানের ইসলামী ঐতিহ্য মুছে ফেলার জন্য ঘৃণ্য কাজে তৎপর রয়েছে। কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা ও মসজিদ পরিচালনায় অন্যায় ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে চালানোর জন্যে জবরদস্তি করে।

সাত ঃ হজ্ব করা ২০ বছর নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে শুধুমাত্র প্রদর্শনী হিসেবে সরকারী অনুমোদন প্রদানের ব্যাপারে সাংঘাতিক ভীতিমূলক কানুন আরোপ করা হয়।

আট ঃ মুসলমানদের হারানো ভূমি এ আরাকান উপত্যকায় অনেক হক্কানী আলেম পীর বুজুর্গের এমনকি সাহাবার কবর পর্যন্ত রয়েছে বলে জানা গিয়াছে। মুসলমানদের সম্মানী ও পবিত্র স্থানগুলো টার্গেট করে সেখানে পায়খানা নির্মাণ করা হয়।

আরাকানীরা নীতিহীন জাতীয়তাবাদের শিকার

আরাকান ও ব্রহ্ম দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, আরাকান থেকে রোহিঙ্গা মুসলমান বিতাড়ন নতুন ঘটনা নয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আরাকানের তৎকালীন রাজা সান্দথুধম্মা তাঁর রাজ্যে আশ্রিত মোগল শাহজাদা সুজাকে স্বপরিবারে নিধন ও সেখানকার মুসলমান নাগরিকদের নির্যাতন করে যে অমানুষিক ঘটনার সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী তিনশত একত্রিশ বছর ধরে বহুবার সেই পুরাতন ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বার্মা সরকারের রোহিঙ্গা মুসলমান বিতাড়নও সেই পুরনো ঘটনারই জের। বার্মার সরকার বা জনগণ যে শুধু বারবার মুসলমান বিতাড়নের ও নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছে তা নয়, স্বাধীন আরাকান রাজ্যের বিলুপ্তি সাধন করে স্বধর্মী আরাকানী মগ অধিবাসীদের প্রতিও অমানুষিকতার পরিচয় দেয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বার্মা রাজা বোধাপায়া ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করেন। বহু যুদ্ধের পর বর্মী বাহিনীর হস্তে আরাকানী বাহিনী পরাস্ত হয়। বন্দী আরাকান রাজ থামাডারের শিরচ্ছেদ করা হয় এবং বিশ হাজার আরাকানী মগ সেনাকে বিভিন্ন শিবিরে আটক করে এক সঙ্গে সকলকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। তারপর বর্মী সেনাবাহিনী গ্রাম গ্রামান্তরে আরাকানীদের উপর চালায় নির্যাতন ও হত্যা।

আরাকানে বর্মী সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা পরবর্তী সশস্ত্র অপারেশন

নং	অপারেশনের নাম	অপারেশন এলাকা	সন
১	বার্মা টেরিটোরিয়াল ফোর্স(টি.টি.এফ)অপারেশন	উত্তর আরাকান	১৯৪৮
২	মবাস্তি এমিগ্রেশন এন্ড আর্মি অপারেশন	উত্তর আরাকান	১৯৫৫
৩	ইউনিয়ন মিলিটারী পুলিশ(ইউ,এম,পি)অপারেশন	বাংলাদেশের সীমান্ত	১৯৫৫-৫৯
৪	ক্যাপ্টেন টিন ক্যাইউ অপারেশন	সংলগ্ন এলাকা	১৯৫৯
৫	শিউকাই অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
৬	কাইগান অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
৭	নাগা জিন কা অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৭-৬৮
৮	মাইয়াট মন অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৯-৭১
৯	মেজর অং থান অপারেশন	উত্তর আরাকান	১৯৭৩
১০	সেব অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৮-৭৯
১১	নাগামিন অপারেশন(ড্রাগন)	সমগ্র আরাকান	১৯৭৮-৭৯
১২	গেলন অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৯
১৩	শিউ হিনথা অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৯

তখন আরাকানের মোট মগ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মগ প্রাণ রক্ষার্থে আরাকান ত্যাগ করে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ অবধি ষোল বছর যাবৎ আরাকানী মগ শরণার্থীদের চট্টগ্রামে আগমন অব্যাহত থাকে।

সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক ইংরেজ ক্যাপ্টেনের ডায়রী থেকে জানা যায় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মগ শরণার্থী চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে মগ শরণার্থীদের মধ্যে বহু বৃদ্ধ নারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করে। বার্মা রাজ্যের আরাকান বিজয়ের ১৮ বছর পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামুর শাসক কর্তৃপক্ষ শরণার্থী আরাকানী মগদের স্বদেশে ফিরে যেতে বললে তাদের একজন জবাবে বলেছিল যে, আমরা পুনরায় আরাকানে ফিরে যাব না। আপনারা আমাদের হত্যা করতে চান করুন, আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত,যদি জোর করে তাড়িয়ে দিতে চান তবে আমরা পাহাড় পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে বন্য পশুর অধম জীবনযাপন করব। সেদিন বার্মা রাজের নিপীড়নে লক্ষাধিক শরণার্থী মগ নর-নারী ও শিশুর আহাজারীতে নাফ নদীর তীরে আর্তরোল ওঠে। তদানীন্তন বৃটিশ সরকার বিপুল সংখ্যক মগ শরণার্থীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, কক্সবাজার মহকুমা ও বরিশালের পটুয়াখালীতে পুনর্বাসন করেন। প্রায় দু'শ বছর পর বার্মার সরকারের বিতাড়ন নীতির

ফলে আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানন শরনার্থীর নাফ নদী উত্তর তীরে আগমন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটায়। সেদিনের নিপীড়নকারী ছিল মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী বার্মারাজ বেরাধাপায়া। আর আজ বিংশ শতাব্দীর নিপীড়নকারী হল সমাজতন্ত্রের মুখোশধারী বার্মা সরকারের কর্ণধার জেনারেল উইন। ট্র্যাজেডি হলো এখানেই। ১৮২৬ খৃষ্ঠাব্দে প্রথম ব্রম্মযুদ্ধে ইংরেজরা আরাকান অধিকার করে। তখন বিপুল সংখ্যক চট্টগ্রামী মুসলমান আরাকানে বসতি স্থাপন করে। ইংরেজদের আরাকান শাসনকালে রোহিঙ্গা মুসলমানেরা কিছুটা শান্তির দিন যাপন করলেও এই শতকের ত্রিশ দশক থেকে বার্মাদের 'দো-বার্মাধর্মীদের' আন্দোলনের ফলে সে শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়।

আবার আরাকানে মগ রোহিঙ্গা দাঙ্গা-হাঙ্গামারও সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীদের বার্মা অধিকার করার প্রাক্কালে ইংরেজদের পশ্চাদপস্বারণকালে আরাকানী মগেরা অজস্র মুসলমানকে হত্যা ও লক্ষাধিক মুসলমানকে বিতাড়িত করে। যুদ্ধোত্তরকালে জাপানের ফেলে যাওয়া ও গোপন পথে সংগ্রহ করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানরা মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পর বার্মা সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে আরাকানী মগেরা পুনরায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্যাতন ও বিতাড়ন আরম্ভ করে। সে সময় মুজাহিদ বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। যখন তারা কিছু সাফল্য লাভ করে তখন মুজাহিদ বাহিনীর বড় অংশের নীতি ও চরিত্রহীন নেতারা ব্যক্তিগত স্বার্থে নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ডাকাতি -রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। এর ফলে রোহিঙ্গা মুজাহিদ বাহিনীর প্রতিরোধ আন্দোলন ভেঙ্গে যায়। আরাকানের মুসলমান নাগরিকদের জীবনে নেমে আসে দূর্ভোগ ও লাঞ্চনা। সেই ভোগান্তি তাদের আজ পর্যন্ত চলছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গোটা উপমহাদেশের যখন বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন পুরোদমে দানা বাঁধতে শুরু করে, তখন বার্মায় থাকিন পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। বর্মী থাকিন পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের বৌদ্ধ(মগ) সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করে স্বাধীনতা পরবর্তী আরাকানকে বর্মীভুক্ত করতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মগদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ উসকিয়ে দেয়।১৯৩৭ সালে বার্মায় বৃটিশ কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন অনুমোদনের পর বর্মী শাসকরা ক্ষমতার প্রাথমিক স্বাদ পেয়েই পূর্ব পরিকল্পিত

দাঙ্গা বাঁধিয়ে ১৯৩৮ সালে সারা দেশে প্রায় ৩০ হাজার রোহিঙ্গা ও বর্মী মুসলমানকে হত্যা করে।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পরাজিত জাপানীরা বার্মার স্বল্পকালীন ক্ষমতা দখল ছেড়ে দেয়ায় আবার বৃটিশ প্রশাসনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব মুহূর্তের প্রশাসনিক শূন্যতায় সৃষ্ট বিশৃংখলার সুযোগে বর্মীদের সহযোগিতায় আরাকানের মগেরা রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় যা '৪২-এর ম্যাসাকার হিসেবে কুখ্যাত। এ ম্যাসাকার বেসরকারী হিসেব মতে, প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয় প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা। ১৯৪৭সালে বার্মার জাতীয় নেতা অং সাং এর নেতৃত্বে বার্মার স্বাধীনতার চীড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। বৃটিশ সরকার কতৃক প্রদত্ত শর্ত ও চুক্তি মোতাবেক এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, বার্মা ইউনিয়নে অংশগ্রহণে বার্মার সকল জাতি সত্তার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেই বার্মার স্বাধীনতা দেয়া হবে। অং সাং দেশব্যাপী সফর করেন, সকল জাতিসত্তাকে বুঝাতে সক্ষম হন, বার্মার স্বাধীনতার জন্যই প্রথমে সবাইকে ইউনিয়নে থাকতে হবে। জাতিগত ও রাজ্যগত স্বায়ত্তশাসনের কথা পরে বিবেচনা করা হবে। অন্যদিকে আরাকানী বৌদ্ধ নেতাদের কৌশলে অং সাং একথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, এ মুহূর্তে স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেই সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করা হবে। আরাকানের রোহিঙ্গারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দুর্বল ও শক্তিহীন হলে তোমাদের (বৌদ্ধ) হাতে স্বায়ত্তশাসন ন্যস্ত করা হবে। অং সাং এর এই রাজনৈতিক কৌশল সফল হয়।

১৯৪৭ সালে পেনলং এ অনুষ্ঠিত বার্মার স্বাধীনতা উত্তর ভবিষ্যৎ জাতীয় প্রশ্নে আলোচনার্থে অং সাং কর্তৃক আহুত জাতীয় সম্মেলনে মুধুমাত্র বৌদ্ধদেরকেই আরাকান জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। যদিও বা তারা আরাকানের মোট জনসংখ্যার ২৫/৩০ শতাংশ মাত্র। আরাকানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির কোন প্রতিনিধিকে রাজনৈতিক সংলাপ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দশ বছর ইউনিয়নভুক্ত থাকার পর কয়েকটি অঙ্গরাজ্য বিচ্ছিন্নতার অধিকার পাবে। কিন্তু এক সময়ের স্বাধীন-সার্বভৌম রাজ্য আরাকানের বৌদ্ধ প্রতিনিধিরা সম্মেলনে আরাকানের বিচ্ছিন্নতা বা স্বায়ত্তশাসন

সম্পর্কে কোন প্রস্তাব কিংবা প্রশ্নই উত্থাপন করেনি যা অং সাং এর গোপন বৌদ্ধ আঁতাতের রাজনৈতিক কৌশলের ফলশ্রুতি বলেই এখন রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

১৯৪৮ সালে ৪ঠা জানুয়ারী বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। পেনলং কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শান, কাচিন, কায়া, কারেন ও চিন প্রভৃতি রাজ্যগুলো অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। উক্ত রাজ্যগুলো আরাকানের মতোই পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাজ্য। দশ বছরান্তে 'শান' ও 'কায়া' বার্মা ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বর্মী রাজা বোধাপায়া কর্তৃক দখলীভুক্ত আরাকান এক ইঞ্চিও শৃংখলামুক্ত হয়নি।

যে স্বপ্ন আর প্রত্যাশায় ভর করে রোহিঙ্গারা স্বাধীনতা আন্দোলনের উদার নৈতিক জাতীয় নেতা অং সাংকে সমর্থন দিয়েছিলো, পরবর্তীতে শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভি-ইসলামাইজেশন ও সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের নামে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিনাশ সাধন করে ঢালাও বর্মীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের সে প্রত্যাশা গভীর হতাশায় রূপান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পর সাময়িক সংকট কাটিয়ে বার্মা সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মোতাবেক শাসিত হতে থাকে। এ শাসনকাল ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সালে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জেনারেল নে উইন কর্তৃক ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত প্রবাহমান ছিলো। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্বশীল, জবাবদিহিমূলক এমন শাসনতন্ত্রের অধীনে শাসিত হয়েও রোহিঙ্গারা মানবাধিকার ফিরে পায়নি, রেহাই পায়নি জাতিগত রোষানলের শিকার হয়ে নির্বিচার হত্যাকান্ড থেকে।

১৯৪৮ সালে নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রণীত ভোটার তালিকায় 'সন্দেহজনক নাগরিক' অজুহাতে বার্মা কর্তৃপক্ষ আরাকানের মুসলিম অধ্যুষিত জনপদগুলোকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়। বার্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পরবর্তীকালে জাতিসংঘ মহাসচিব উনু'র মতো ব্যক্তিত্ব আরাকানের রোহিঙ্গাদের প্রতি সার্বজনীন সুনজর প্রয়োগ করতে পারেনি– ব্যর্থ হন ন্যূনতম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। এই উনু'র শাসনকালেই স্বাধীনতার পর পর আরাকানে রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অভিযান চলে, সে সময় রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, পালানোর সময় হত্যা করা ইত্যাদি অপকর্মে নেতৃত্ব দেয় বার্মা টেরিটরিয়াল ফোর্স বা বি-টি-এফ। জানা গেছে, বার্মার কেন্দ্রীয় সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবেই শতকরা ৯০ ভাগ মগ নিয়ে এই ট্যাঙ্গাড়ে বাহিনী গড়ে

তোলে বাস্তবায়নের জন্য। (সূত্রঃ প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসী, লেখক-আবদুল হক চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৪)

আলিম সমাজের উপর নির্যাতন

আরাকানে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন আলিম সমাজ। বর্মী সেনা ও কর্তৃপক্ষের এক নম্বর টার্গেট হলেন এ আলিম সমাজ। আলিম সমাজকে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান বাধা মনে করে তাঁদের উপর ভয়ংকর নির্যাতন চালায়। এখানে একটি উদাহরনের মাধ্যমে এর কিছুটা ধারনা দেয়া হল। এ অভিজ্ঞতার শিকার হলেন আরাকানের একজন প্রখ্যাত আলিম ব্যক্তি যিনি নির্যাতনের ফলে হিজরত করে বাংলাদেশে আসেন এবং তার মর্মান্তিক কাহিনী এ দেশের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এখনও নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে দেশের বাহিরে অবস্থান করছেন। তিনি এভাবে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করেছেন–

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ কুমিরখালি এলাকায় আমরা বেশ কিছু লোক স্থানীয় সেনা ক্যাম্প থেকে একটি হুকুমনামা পাই। তাতে লেখা ছিল, প্রত্যেক গ্রাম থেকে ১০জন যুবতী যারা অবিবাহিতা তাদের পিতা যেন মেয়েদের নিয়ে অবিলম্বে কুমিরখালি ক্যাম্পে হাজির হয়। হুকুমনামার সাথে প্রত্যেক গ্রামের ১০জন মেয়ের একটি লিস্টও প্রেরণ করা হয়। যা ছিল প্রথম শ্রেনীর আলেম ব্যক্তিদের মেয়েদের তালিকা। শেষে লেখা ছিল, এসব মেয়েদের নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষন দেয়া হবে। ৬মাস মেয়াদি এ প্রশিক্ষন কোর্সের সময় মেয়েদের ক্যাম্পের বাইরে আসতে দেয়া হবে না বা তাদের কোন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে দেয়া হবে না। অবশেষে হুমকি দেয়া হয়, যদি কোন পিতা তার মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হতে না চায় তবে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এ ছিল আরাকানের আলেমগনকে মানসিকভাবে নির্যাতন ও তাদের ধর্মীয় চেতনার ওপর আঘাত হানার ভয়ঙ্কর এক পূর্বপরিকল্পিত নীল নকশা। এর পূর্বে প্রায়ই গ্রাম থেকে সেনারা মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যেত এবং কারিগরি শিক্ষা দেয়ার নাম করে তাদের লাইগেশন(চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব) করিয়ে ক্যাম্পে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালাত। তাই মেয়েদের সেনা ক্যাম্পে নিয়ে কারিগরি শিক্ষা দেয়ার

নামে কি ঘটে তা সকলেই জানত। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আবার সবাই তটস্থ হয়ে পড়ে এ কারণে যে, সরকার যা বলে তা করে ছাড়ে। ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার ফজরের নামাজের সময় সেনারা গ্রামে আগমন করে এবং মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের মাঝে মেয়েদের লিষ্ট বিতরন করে তাদের নিজ নিজ মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হতে বলে। আমরা কয়েকজন ব্যক্তি মেয়েদের না নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হই। অফিসার আমাদের একা হাজির হতে দেখে রাগান্বিত হয় এবং ধমক দিয়ে মেয়েদের না আনার কথা জিজ্ঞেস করে। আমরা উত্তর দেই, শরিয়তে আমাদের মেয়েদের একা একা কোন স্থানে থাকা নিষেধ আছে। পরে আমাদের ঝিমুর খালি ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। সেখানের অফিসারও মেয়েদের সাথে না দেখে রাগান্বিত হয় এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করে। আমরা তাকেও একই উত্তর দেই। তখন সে আবার জিজ্ঞেস করে, কোথায় তোমাদের আইন লেখা আছে। উত্তর দেই কোরআন শরীফের ১৮ পারায় এ উত্তরে অফিসার ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং অধীনস্থ সেনাদের দিয়ে আমাদের পরনের কাপড় চোপড় খুলে নেয়। এরপর সেনা ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী নোংরা ও আবর্জনাময় স্থান পরিস্কার করতে আমাদের বাধ্য করে। আমাদের সাথে মাওলানা সিরাজুল হক নাম ১১৫ বছরের বৃদ্ধ একজন আলেম ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি বসে বসে তসবিহ আদায় করছিলেন। সৈন্যরা তার তসবিহ কেড়ে নিয়ে তাকেও আবর্জনা পরিস্কার করতে বাধ্য করে। জোহরের নামাজের সময় হলে আমরা অফিসারের কাছে নামাজ পড়ার সময় চাই। কিন্তু তারা আমাদের সময় দিতে অস্বীকার করে। বেলা ২টার দিকে আমাদের এ অবস্থায় উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট পাঠানো হয়। সেখানে আলেমদের এক লাইনে এবং সাধারণ মানুষদের আর এক লাইনে বাসানো হয়। অফিসার আমাদের মেয়েদের না নিয়ে আসার কথা জিজ্ঞেস করায় আমরা শরিয়তের আইনের কথা বলতেই সেও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বলে তোমাদের শুধু শরিয়ত নয় সরকারী আইনও মানতে হবে।

আমি উত্তর দেই, সরকারী আইন যদি শরিয়তের বিরুদ্ধে না হয় তবে আমরা মানব, কিন্তু তা যদি না হয়, আমরা মানব কিভাবে? তখন অফিসার বলে "অন্যান্য মুসলিম দেশের মেয়েরাতো পর্দা মেনে চলে না, তারা একা একা রাস্তায় বের হয়। তারা যদি পারে তবে তোমাদের মেয়েরা তা পারবে না কেন? আমি বললাম, অফিসার তোমাদের ধর্মে তো চুরি করা, মানুষ খুন করা, জেনা করা মহাপাপ। অথচ তোমাদের সমাজের অনেকেই তা মানছে না। তাই বলে কি তোমাদের

সবাই মাজহাব অস্বীকার করে ধর্ম বিরোধী কাজকে পছন্দ করে? এর কোন উত্তর না দিতে পেরে অফিসার থ মেরে যায়। কিন্তু দাম্ভিক শোনে যুক্তির কথা? সে আমাকে গাছের সাথে বেঁধে বেত্রাঘাত করে আর বলে, তোমার আল্লাহ্ তোমাকে মারছে।

আমি মুখ বুঝে আঘাত হজম করি আর জিকির করতে থাকি। এক সময় আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে আমাকে একটি রুমের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে এক বীভৎস দৃশ্য দেখতে পাই যা আমি জীবনে কোন দিন কল্পনাও করিনি। আমার সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে উঠে। আমি দেখতে পাই, আমার সামনে সুন্নিতি কাটা দাড়ীর স্তুপ। আরাকানের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন আলেমের দাড়ি কেটে ফেলে স্তুপ করে রেখেছে নরপশুরা। এ সব আলেমের মধ্যে তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা নবী হোসেন, বার্মার মুফতিয়ে আজম মাওলানা সুলতান আহমদ সাহেব মাওলানা জাফর আলি সাহেব অন্যতম। আমাকে দেখে তরা লজ্জায়, অপমানে মাথা নিচু করে ফেলে। তাদের একটাই অপরাধ সেনাদের মর্জী মাফিক তারা তাদের মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হতে অস্বীকার করেছিল। পরে আমার পালা আসল। হায়েনার দল জোর করে আমার সযত্নে লালিত রাসুল (সাঃ) এর সুন্নতী দাড়ি কেটে ফেলল। সুন্নতের এই অপমান দেখে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। কিন্তু হায়! আমি যে অসহায়। পরে উপস্থিত ১০টি গ্রামের নির্দিষ্ট করা ১০০ মেয়ের পিতাকে আমাদের অবস্থা দেখিয়ে সাবধান করা হয় তাদের হুমকি দেয়া হয়, কেউ যদি সরকারী আইন মানতে অস্বীকার করে তবে তার অবস্থা এর চেয়েও ভয়ংকর হবে। আমাদের পরদিন ১০টার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে হাজির হতে নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। আমি ঐ দিন বাড়ী ফিরে রাত্রেই পরিবার পরিজন নিয়ে বাংলাদেশে হিজরত করি। এ ঘটনা আরাকানে হাজারো নির্যাতনের মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটি মাত্র। প্রতিদিন এধরনের অসংখ্য লোহমর্ষক নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটেই চলেছে। কিন্তু আর কত এভাবে আমরা নির্যাতিত হবো? বিশ্ববাসী আমাদের এ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে না? তাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের মুসলমান ভাইদের কাছেও আমার একই জিজ্ঞাসা, মুসলমান হিসেবে এ জুলুম অবসানে আমাদের পাশে দাঁড়ানো কি আপনাদের দায়িত্ব নয়?

ইতি

মাওলানা জিয়াউল হাকিম

আরাকান, বার্মা।

রাজনৈতিক নিপীড়ন

এক ঃ বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর আরাকানের মুসলমানরা আরাকানকে বার্মার অংশ হিসেবে অন্তুর্ভূক্তিকে মেনে নিতে পারেনি। মঘী বুদ্ধদের ষড়যন্ত্রের কারণে আরাকানে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতেই মুসলমানদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। বর্মী সরকার মুসলমানদের ক্ষোভ বাড়াতে থাকে। বর্মী সরকার মুসলমানদের ক্ষোভ দমনে নির্মম পন্থা বেছে নেয়। তারা আরাকানী উগ্র বুদ্ধদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী (বি-টি-এফ) গঠন করে মুসলমানদের ওপর লেলিয়ে দেয়। মঘ ডেপুটি কমিশনার ক্যাইউ নেতৃত্বাধীন এ সাম্পদায়িক বাহিনী মুসলিম জনপদগুলো জ্বালিয়ে দেয়, হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। বর্মী সরকার এ বাহিনীকে এ বলে মুসলিম হত্যায় প্রলুব্ধ করেছিল যে, তারা যদি মুসলমানদের ক্ষমতাহীন করে ফেলতে পারে তবে আরাকানের স্বায়ত্ত শাসনভার তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

১৯৪৭ সালে বার্মায় দেশব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে ভোটার তালিকা থেকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো পরিকল্পিতভাবে বাদ দেয়া হয়। মুসলমানদে সন্দেহজনক নাগরিক অজুহাতে ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়নি। ১৯৪৮ সাল থেকে ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে মুসলমানদের বিদেশী আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চাপিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বিদ্বেষ, শোষণ, বঞ্চনার শিকারে পরিণত করা হয়।

দুই ঃ রোহিঙ্গা মুসলমানরা তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিলের জন্য নে উইনের আমল থেকে কোন রাজনৈতিক দল গঠন ও স্বাধীনভাবে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারতো না।

তিন ঃ রোহিঙ্গাদের প্রতিরক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ দেয়া হয় না এবং সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বৈষম্যশূলক নীতি অবলম্বন করা হয়। রোহিঙ্গাদের কোন রাজনৈতিক পদে আসীন করা হয় না।

চার ঃ দেশীয় আইনের দৃষ্টিতে রোহিঙ্গারা অন্যান্য নাগরিকের সমান নয়। আইনে তাদের প্রতি ইনসাফ করা হয় না। শাসক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ

অনুসারে আদালত এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরন করে থাকে। বস্তুতপক্ষে আদালত ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পাঁচ ঃ রোহিঙ্গাদের বেআইনী প্রবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইমিগ্রেশন আইনের অধীনে তদন্তের নামে তাদের বিরুদ্ধে বারবার সশস্ত্র অপারেশন চালানো হয়। অসংখ্য রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার ও বার্মা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং গণহত্যা চালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে।

ছয় ঃ ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন, যা নে উইন পার্লামেন্টে গৃহীত হয়, তাতে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রবিহীন (State less) লোক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

আরাকানে মানবধিকার লংঘন

ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা চেঙ্গিস ও নাৎসী বাহিনীর বর্বরতার কথা জানতে পেরেছি কিন্তু চোখে দেখিনি। রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন উহুদীবাদী ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নির্যাতনকেও ছাড়িয়ে গেছে। রোহিঙ্গারা এক অবর্ণনীয়, অসহনীয় এবং বেদনা বিহ্বলভাবে কালাতিপাত করছে। সত্যিই প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী বর্তমান আরাকান যেন একটি "মঘের মুল্লুক"। যেখানে মুসলমানদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করা হয় না, যেখানে জীবন, সম্পত্তি ও ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা নেই। দীর্ঘ দিনের ইসলামী ঐতিহ্যমন্ডিত আরাকানে যে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা আজও উজ্জলতার ভাষ্কর। এত অত্যাচার, ধ্বংসাভিযান সত্ত্বেও আরাকান ভূখন্ড থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ঐতিহ্যমন্ডিত এ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। এখনও অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, বিশেষতঃ বদরে মোকাম মসজিদ ও আকিয়াবের গ্রান্ড মসজিদ এবং অসংখ্য আউলিয়া কেরামের মাজার তার সাক্ষ্য বহন করে। গোটা মুসলিম উম্মার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমান সম্প্রদায়। তাঁরা মিল্লাতে ইসলামিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশেস করে একই মুসলিম সালতানাতের শাসনাদীনে থাকার কারনে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সাথে আরাকানের মুসলমানদের গভীর আদর্শিক ও ঐতিহাসিক

সম্পর্ক রয়েছে। মুসলিম বিশ্ব থেকে অবিচ্ছিন্ন ইসলামী উম্মার এ অংশটি আজ বার্মার সাম্প্রদায়িক শাসনাধীনে, মৌলিক মানবীয় অধিকার, নাগরিকত্ব ও স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তাদেরকে সেখানে সংখ্যালঘুর মর্যাদাও দেয়া হচ্ছে না। যা আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার লংঘন। তাই রোহিঙ্গা মুসলমানরা জীবন ও সম্পত্তির বিনিময়ে হলেও দীর্ঘদিন ধরে স্বকীয় ঈমান, আক্বীদা রক্ষার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য জিহাদ করে আসছে। রোহিঙ্গা মুসলমানগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যে তাঁরা নিজস্ব আদর্শিক ঐতিহ্য ও স্বাধিকারের জন্য জীবনের শেষ রক্ত বিনদু পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবে।

আরাকান ইস্যুঃ
দৃষ্টির অগোচরে পাহাড়সম সমস্যা

বাংলাদেশে এ মুহূর্তে কত রোহিঙ্গা শরণার্থী আছে, তার কোন সঠিক হিসেব আমাদের জানা নেই। সরকারি পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ সরকারের খাতায় যাদের নাম লেখা আছে, শুধু তাদের খবরই ঐ পরিসংখ্যানে পাওয়া যায়। কিন্তু বহু রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে; অনেকেই কক্সবাজার বসতি গেড়েছে; অন্যরা চট্টগ্রামে পর্যন্ত হাজির হয়েছে, বেঁচে থাকার আশায়। মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা এসেছেন। কিন্তু সমস্যাটির জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তেমন জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এবং বার্মা সরকারও সদিচ্ছা প্রদর্শন করেনি। যার ফলে এখনও শরণার্থী সমস্যা বাংলাদেশে রয়ে গেছে। এরা কবে ফিরে যাবে, আদৌ যাবে কিনা কেহ বলতে পারে না। কিন্তু এ সমস্যার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গা সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের জন্যে উদ্যোগ নিতে হবে বাংলাদেশকেই। বার্মার মিলিটারী শাসকরা বিশ্বমতের খুব একটা ধার ধারে বলে মনে হয় না। সেদেশের বিরোধী নেত্রী অং সান সুকি পাঁচ বছরের বেশী সময় বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে রাজনীতি করতে পারছেন না। সুকি শুধু একজন

রাজনৈতিক নেত্রীই নন, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারও পেয়েছে কয়েক বছর আগে। তাঁকে বন্দী করে রাখার জন্য বিশ্বের সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কিন্তু বার্মার রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলা রক্ষা কমিটি তার প্রতি কর্ণপাত না করে তাদের ইচ্ছামত সময়ে সুকিকে মুক্তি দিয়েছে। কাজেই বাংলাদেশকে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে সরাসরি বার্মা সরকারের সঙ্গেই আলাপ করতে হবে। এ বিষয়টি নিয়ে কোন আঞ্চলিক ফোরামের অথবা অন্য কোথাও আলোচনা করে তেমন লাভ হবে না, যদিও বিশ্ব জনমত তৈরি হলে সমস্যাটি নিষ্পত্তির পক্ষে কিছু পরোক্ষ ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাটি একটি পুরনো সমস্যা। রোহিঙ্গারা মুসলমান এবং বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে এদের বসবাস। অন্যদিকে বার্মার সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। রোহিঙ্গা সমস্যার সূত্রপাত এই ঐতিহাসিক অবস্থাটি থেকে। জাতিগত দাঙ্গা,জাতিবিদ্বেষ এবং অর্থনৈতিক কারণ একত্র হয়ে এই সমস্যাটিকে প্রকট করে তুলছে। বার্মার সীমান্ত রক্ষী ও প্যারামিলিটারী বাহিনী নাসাকা নিয়মিত ভিত্তিতে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে এবং তাদের ঘরবাড়ী, জমিজমা স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন দখল করে নিচ্ছে এবং এ কাজের সহায়তা দিচ্ছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও নাসাকা বাহিনী। জিয়াউর রহমানের সময় একবার বিশাল সংখ্যায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে কিন্তু তাদের প্রায় সকলকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের সফল কূটনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এরপর যতবার রোহিঙ্গাদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশে, আমাদের কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছে তাদের ফিরিয়ে দিতে। বেগম খালেদা জিয়ার সময় যে সর্বশেষ রেহিঙ্গা শরণার্থী পুশ ইন করা হয় বাংলাদেশে, তার একটা সমাধান হয়েছিল কাগজে কলমে, কিন্তু প্রকৃত সমাধান সম্ভব হয়নি। সে সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান মিটিং করেছেন তার বার্মিজ সমকক্ষের সঙ্গে। রেঙ্গুন সফর করে বার্মা সরকারের উপর মহলের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছেন। কিন্তু অর্ধেকেরও বেশী শরণার্থীকে এদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করতেই রাজী হয়নি বার্মা সরকার। এরপর সরকারী পর্যায়ে মৃদু তৎপরতা বজায় থাকে কিছুদিন। কিন্তু কালক্রমে

রোহিঙ্গা ইস্যুটি কার্পেটের নিচে ঠেলে দেয়া হয়। বর্তমানে এ অবস্থাতেই আছে সেটি। আমাদের সরকারগুলো প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে 'সুসম্পর্ক' বজায় রাখতে এতটা নিবেদিত প্রাণ যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও সম্পর্ক রক্ষার পবিত্র যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে যায়।

দেশের ভিতরকার অসংখ্য সমস্যা নিয়ে হিমশিম খাওয়া সরকার সীমান্ত সংলগ্ন শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ততটা আগ্রহ দেখায় না।কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্যাটি ভুলে যাওয়া আমাদের জন্য উচিত হবে না। রোহিঙ্গাদের একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে দেখতে হবে। তেমনি বাংলাদেশে তাদের অবস্থানের জন্য যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা হচ্ছে সে সবও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। সম্প্রতি কাগজে এই রকম সংবাদ বের হয়েছে যে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে আইন শৃংখলা সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে কোন শরণার্থী শিবির অঞ্চলে এগুলো হয় এবং সমাজতত্ত্ববিদরা আগেভাগেই এর অতিরিক্ত কিছু সমস্যাও চিহ্নিত করে দিতে পারেন। ইউনিসেফ রোহিঙ্গা শিশুদের মধ্যে নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ও সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কারণ শরণার্থী শিবির মানেই একটি নারকীয় পরিবেশ যেখানে বিশুদ্ধ পানি এবং সঠিক পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা অকল্পনীয়। শিশুরা হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

এসব সমস্যা একটি দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেটি হচ্ছে এদের সমাধান। অবশ্যই প্রথম এবং প্রধান সমাধানটি হওয়া উচিত সকল শরণার্থী প্রত্যাবর্তন এবং একরকম নিশ্চয়তা আদায় করা যে বার্মার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলাদেশ সরকারকে বলে দেবে যে, ভবিষ্যতে কোন রোহিঙ্গা পুরুষ বা নারীকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হবে না। কিন্তু এই সমাধান যত দিন যাচ্ছে ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বার্মার সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করছে বটে এবং চুক্তি-টুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে কিছু শরণার্থী পুনর্বাসনও হয়েছে। অর্থাৎ বার্মা কর্তৃপক্ষ কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সরকারীভাবে ১০জন (অর্থাৎ বেসরকারীভাবে

১৫-২০জন) রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে ৫-৬জনকে এক দেড় বছর পর গ্রহণ করা হলে লাভটা কি? এতে বিশ্বের মানুষকে বরং বার্মিজরা বেশ মুগ্ধই করে ফেলবে। বিশ্ব দেখল যে, বার্মা তাদের শরণার্থী ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু শেষ শরণার্থীটি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কেন বাংলাদেশ হাল ছেড়ে দেবে? কেন সকল রোহিঙ্গা ফিরে যাবে না? অথবা বাংলাদেশ এই অনাবশ্যক এক আপদ থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবে না? রোহিঙ্গা সমস্যা যে দীর্ঘস্থায়ী হবে তার ইঙ্গিত বহু আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। সাদা চোখে দেখলে এর তিনটি কারণ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দাড়াঁবে। এর প্রথমটি হচ্ছে, বার্মার জাতিগত বিন্যাস এবং এর থেকে উদ্ভূত জাতিবিদ্বেষ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বার্মায় গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং স্বৈরাচারী সামরিক শাসন, আর তৃতীয়টি হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ভিতর ক্রিয়াশীল ভীতি এবং অনিশ্চয়তা। আমরা হয়তো চাইবো যে, সকল রোঙ্গিা ফিরে যাক ; কিন্তু এখনও যে, এত প্রতিকূল পরিবেশে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তার অর্থ হচ্ছে তারা স্বদেশে ফিরে যেতে আগ্রহী নয়। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় বার্মার খবর কদাচিৎ পাওয়া যায় এবং যা পাওয়া যায় সেগুলো আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সমূহ থেকে পাঠানো স্থানীয় সংবাদ। বিশেষ করে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকার সংবাদ একেবারেই অনুপস্থিত। যদি ঐ সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহলে রোহিঙ্গাদের সমস্যার ব্যাপকতাটা বুঝা যায়।

কিছুদিন আগে বার্মার রেঙ্গুন এবং মান্দালয় শহরে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গার ফলে রোহিঙ্গা সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে পড়েছে। বার্মার লোকজন দাঙ্গাবাজ নয় বলেই আমরা জানতাম, বিশেষ করে ধর্মের প্রশ্নে। ভারতে গত দেড় দশক ধরে মৌলবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উত্থান হয়েছে এবং ধর্মীয় দাঙ্গা বেড়েছে; অসহিষ্ণুতা বেড়েছে শতগুণ। এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু বার্মা এক্ষেত্রে বেশ শান্তি বজায় রেখে চলেছিল উত্তর সীমান্তে রোহিঙ্গাঁদের ক্ষেত্র ছাড়া। কিন্তু দেশের রাজধানীতে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা একটা অশনি সংকেতই দিচ্ছে। দীর্ঘদিনের সামরিক শাসন বার্মীজদের অসহিষ্ণু করে তুলছে। এর আরও বিরুপ প্রভাব পড়বে ভবিষ্যতে। হয়তো এরকম দাঙ্গা

আরো ঘটবে এবং আরো তীব্রতর হয়ে ঘটবে। অবশ্য এর থেকে মারাত্মক খবর হল মুসলমান জনবসতিগুলো উচ্ছেদের। স্থানীয় আইন-শৃংখলা রক্ষা কমিটি গত নভেম্বর ১৯৯৫ ইং বুচিদং সংলগ্ন ৮টি পাড়া উচ্ছেদ করেছে। একইভাবে মিনবিয়া কেউকথ, আকিয়াব, মিউহং এবং আরাকানের অন্যান্য অঞ্চলে অসংখ্য মুসলিম বসতবাড়ী উৎখাত করেছেন এবং গ্রামবাসীকে জোরপূর্বক বুচিদং এবং মংডুতে নিয়ে এসে খোলা আকাশের নীচে রাখা হয়েছে।

কাজেই রোহিঙ্গাঁদের বার্তায় ঠেলে দিলে যেমন সমস্যা সমাধান হবে না, তেমনি বর্তমানে মৃদু টর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেলেও তা হবে না। যদি বার্মা কর্তৃপক্ষ এরকম আশ্বাস না দেয় যে, রোহিঙ্গাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান পুরোপুরি বন্ধ করা হবে, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে হয়রানির সম্মুকীন হতে হবে না, তাহলে শুধুমাত্র রোহিঙ্গাঁদের ফিরিয়ে নেওয়াটা সমাধানের একটা অংশমাত্র হতে পারে, পুরো সমাধান এটি হবে না। আমরা একরকম নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাঁদের পুশ ব্যাক করতে পারি না–বিষয়টা নিতান্তই অমানবিক হবে বিধায়। কিন্তু একই সাথে রোহিঙ্গাঁ সমস্যাটি অনন্তকাল আমাদের কাঁধে ভর করে থাকতে পারে না। সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান অবশ্যই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কূটনৈতিক পর্যায়ে এবং ক্রমান্বয়ে তা সর্বোচ্চ(সরকার প্রধান) পর্যায়ে পর্যন্ত যাবে। আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশ সরকার যদি বার্মার সরকারকে এটি বোঝাতে সক্ষম হয় যে, রোহিঙ্গা সমস্যা সৃষ্টি করে সাময়িক কিছু লাভ হলেও শেষ পর্যন্ত বার্মার ক্ষতিই হবে বেশী এবং বাংলাদেশের বন্ধুত্ব যদি বার্মা চায়, তাহলে এই সমস্যা তাদের আন্তরিকতার সাথে সমাধান করতে হবে, তাহলে কাজ হতেও পারে। সামরিক অথবা স্বৈরাচারী যে ধরণের সরকারই হোক এই যুক্তিকে একসময় সে সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে নিজের স্বার্থের জন্যে হলেও। এখন এই যুক্তিটা যত অকাট্যভাবে এবং যতটা জোরের সাথে বাংলাদেশ তুলে ধরতে পারবে ততই রোহিঙ্গাঁ সমস্যার সমাধান নিকটবর্তী হবে। (দাওয়াত দিপোর্টার)

হায় আরাকানেররোহিঙ্গা মুসলমান !

যদি এ মুহুর্তে কোন গ্রামের এক ভদ্রলোক এসে বলে যে, আরে ভাই আমরা বিষাক্ত সাপের ভয়ে থাকতে পারছিনা। যদি বলে আমাদের পরিবারের অমুক সদস্যকে গত কল্য রাত্র আটটার সময় বাড়ির পাশ্ববর্তি একটি গর্ত থেকে একটি সাপ এসে আমাদের শ্রদ্ধেয় বাপ জানকে মেরে ফেলছে ইত্যাদি। খবরটি দেয়া হলো গ্রামের কোন এক বয়েজ ক্লাবে, কিংবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে। তখন অবস্থাকি দাড়ায়? অবস্থা আরকি গ্রামের বয়েজ ক্লাবের তরুনেরা প্রথমে লোকটির কথায় আফসুসের গরম নিঃশ্বাস ফেলবে। দয়ালু হলে ক্লাবের প্রতিটি তরুন হৃদয় থেকে হু!হু! করে কেঁদে ফেলবে। প্রতিটি তরুন সদস্য বিষাক্ত সাঁপটির বিষাক্ত দন্ত গুড়িয়ে দিতে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে যাবে। রে ---- রে ----- রে ---- বলে মোটা থেকে লাঠি নিয়ে বের হবে। কেউবা আবার খন্তা সাবাড় সংগ্রহ করে রওয়ানা হবে সাঁপটির গর্ত খোড়ার জন্য। কেউবা কোঁচ টেঁঠা হাতে নেবে। বুদ্ধিমান তরুনদের মাঝে কেউ আবার গরম পানি ঢেলে দিয়ে সাপ কে গর্ত থেকে বের করার পদ্ধতি গ্রহণ করবে। উদ্দেশ্য একটিই আর তা হল বিষধর সর্প থেকে আমার মানব সন্তানকে বাচাতেই হবে। বাঁচাতেই হবে আমার মানব পরিবার। যে কোন পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্বার জন্য আমরা এ কাজটি করে থাকি এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট মানবতার প্রকৃষ্ট প্রমান। মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য। প্রত্যেক মানূষই একে অপরের আত্মীয় অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মুসলিম সন্তানদেরকে বিষাক্ত সাঁপের চেয়ে মারাত্মকভাবে দংশন করছে প্রতিবেশী বার্মা সরকার। বৃটিশ সরকারের শিখানো পদ্ধতি Burma for The Buddhist Burmans উচ্চারণ করে বার্মার মুসলমান এবং আরকানী মুসলমানদের যাবতীয় নির্যাতন করেই আসছে। তারা মুসলমানদেরকে বিতাড়নের কু স্পৃহা নিয়ে সেখানকার মসজিদ, মাদ্রাসা, ইবাদত খানা, এমনকি কোরআন কিতাবের শত শত কপি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুসলিম মা বোনদের দাসী বাঁদী হিসেবে ব্যবহার করছে। নারী নির্যাতনের মাধ্যমে মুসলিম মহিলাদের গর্ভপাত করে মায়ের সামনে তাঁর সন্তানকে পাখির মত হত্যা করছে। এ হিংস্র জন্তুদের কবল থেকে পরিত্রান পেতে সেখানকার

আবাল বৃদ্ধ অসহায় বাঁচাও বাঁচাও আত্ম চিৎকার করছে। কিন্তু তাদের আত্ম চিৎকার আল্লাহর আরশে খবর হলেও আমাদের মনে তেমনটি যেন দাদা কাটেনা। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে কোন আলোচনা করিনা। মজলুমের আত্ম চিৎকারে একটু ওহ! ওহ! শব্দ ও বলতে যেন আমরা লজ্জা পাই। হায়রে আমাদের মানবতা বোধ। হায়রে আমাদের বিবেক বুদ্ধি প্রতিটি মানূষ এক আদমের বংশ ধারা এবং মুসলমান হচ্ছে একই দেহের মত! দেহের এক অংশে ব্যথা লাগলে অন্য অংশেও ব্যথা লাগার কথা। কিন্তু না আমরা এ নিয়ে ভাবিনা। ১৯৪২ সালে বৃটিশের প্ররোচনায় এক লক্ষেরও বেশী মুসলমানকে নৃশংস ভাবে মঘেরা হত্যা করে। ১৯৪৭ সালে বার্মার মুসলমানদের ভোটাধিকার দেয়া হয়নি। ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের আরাকান থেকে বিতাড়ন করতে গণ হত্যা চালায়। গৃহহীন হয়ে ৩০,০০০ হাজার আরাকানী মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে আসে। ১৯৭৮ সালে পরিচালিত নামাগিন ড্রাগন অপারেশন নজির বিহীন পাশবিকতার সাক্ষ্য বহন করে। এ অপারেশনে মুসলমান এলাকা গুলোতে ধ্বংস যজ্ঞ ও গণহত্যার ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। ১০,০০০ হাজারের ও অধিক লোককে হত্যা করা হয় এবং বাধ্যতামূলক বিতাড়নের ফলে ৩,০০,০০০ তিন লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। যাদের মধ্যে ৪৫,০০০ হাজার শিশু ও বৃদ্ধ উদ্বাস্তু ক্যাম্পে মারা যায়।

১৯৮২ সালে রোহিঙ্গাদের সাথে কঠোর বৈষম্যমূলক ও নিপীড়ন করা হয়। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদেরকে জেলে পুরেছে ও গুলি করে হত্যা করেছে।

১৯৯১ সালের বর্মী সামরিক জান্তা Slorc বাহিনীর বর্বতার শিকার হয়ে লাশ হয়েছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা। অধিকাংশ মা-বোনের ইজ্জত লুটে নিয়েছে ওরা। নিগৃহীত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে ৩,০০,০০০ লাখ মুসলমান। তারা এখন Refugee Camp এ মানবেতর জীবন কাটছে। অধিক লোককে হত্যা করে এবং বাধ্যতামূলক বিতাড়নে ৩,০০,০০০ তিন লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। যাদের মধ্যে থেকে ৪৫, ০০০ হাজার শিশু ও বৃদ্ধ উদ্বাস্তু ক্যাম্পে মারা যায়। তার পর এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

উদ্দেশ্য কি তাদের?

উদ্দেশ্য মুসলমানদের উচ্ছেদ করা।

উদ্দেশ্য মুসলমানরা এক খোদার কথা বলে কেন?

উদ্দেশ্য নীতি নৈতিকতা, মানুষের জীবন যাপনে মানবতা বোধের উচ্চারণ করে কেন?

অথচ চোখ বুঁঝে আমরা মুসলমানরা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছি। নীরব নিথর হয়ে রয়েছে মানবতার শিক্ষক পরিচয় দানের বড় বড় লেকচারার। ও আই সি, রাবেতা, আরব লীগ, সার্ক, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রের নামধারী বড় বড় গরু হজমকারী মুসলমানরা। মানবধিকার নামের একটি সংস্থা ও বিশ্বব্যাপী বিবৃতি বক্তৃতা দিয়ে থাকে তারা ও এ ব্যাপারে কিছু একটা করতে উদ্যোগী হয়না। এই কি তাদের মানবতার পরিচয়? জালিমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে কি মানবিকতার পরিচয় দেওয়া যায়? মানবধিকার বাস্তবায়ন করার সংজ্ঞা এঁরা যতুটুকু করছে তা প্রমান হয়ে যায় এসমস্ত কর্ম কান্ডে। যেখানে মুসলমান নির্যাতন অহরহ হচ্ছে সেখানে ওদের নীরবতা। হায় মানবাধিকার! হায় মানবাধিকার সংস্থা। মানবাধিকার নাম দিয়ে মানবতার কথা না বললে মানবধিকারের ব্যাপারে লোকে তাও হয়তো এরা জানেনা। আসলে এটি হিজড়াদের যৌন হয়রানির মত। হিজরারা যুবক আকৃষ্ট করতে মেয়ে লোক সাজে। জাতিসংঘ বলেন আর মানবাধিকার বলেন, ও আই সি, বলেন এরা কি কর্মের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করতে পারবেন? যে, আমরা কথা ও কাজে এক আমরা অবিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী আমরা মানবাধিকারের প্রশ্নে নীতিতে অটল। মানবাধিকারের কাজ তো হল নিপীড়িত মানূষকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করত শান্তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা। মানবাধিকার প্রশ্নে সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে বার্মা সরকার বাধ্য হয়ে নির্যাতন বন্ধ করত এবং আরকানে ও বার্মায় মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করত।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের জন্যে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা একটি আরোপিত ও অনাকাংখিত সমস্যা। আমাদের জন্য এটি আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাতো বটেই, এ সমস্যা মারাত্মকভাবে রাজনৈতিক উৎকণ্ঠার বিষয়। যতই দিন যাচ্ছে ততই সবার দৃষ্টির অগোচরে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করা হচ্ছে মনে হলেও সরকারী টরিসংখ্যানের বাইরে অনেক আরাকানী রোহিঙ্গা বিক্ষিপ্তভারে অবৈধ উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গবেষক রতন লাল চক্রবর্তী এর গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলাদেশ–বার্মা সম্পর্ক' সূত্রমতে "ভৌগলিকভাবে সন্নিহিত বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে বহুকাল পূর্ব হতেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম ছিল আরাকান-রাজের দখলে(কিন্তু বার্মার নয়)। ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আরাকানীদের বসতি দানের নীতি গ্রহণ করে। অবশ্য চট্টগ্রামের দক্ষিণকূলে আরাকানীদের বসতি দেবার পেছনে মগদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলা ছাড়াও দক্ষিণকূলের অনাবাদী অংশ আবাদী করে তোলাও কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৮৫ সালে বর্মী রাজা বোধাপায়া আরাকান দখল করলে বার্মা বাংলাদেশের নিকটতম দক্ষিণ পূর্ব প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।" আর আরাকানের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিশেষ করে বর্মী রাজ অবৈধভাবে স্বাধীন আরাকান দখল করায় উদ্বাস্তু সমস্যা বৃদ্ধি পায়। এ মসয়ে দলে দলে রোহিঙ্গা হিন্দু, রোহিঙ্গা মুসলমান, চাকমা,মগ এবং বড়ুয়ারা বৃটিশ-ভারতভুক্ত এলাকা কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। কানাডার মন্ট্রিলে কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে করা এম, বাহারের The arakani Rohingyas in Burmese Society শিরোনামের এক পিএইচডি থিসিসে উল্লেখ করা হয় যে, যার নামে কক্সবাজারের নামকরণ করা হয়েছে সেই ক্যাপ্টেন কক্স-ই উদ্বাস্তু শিবিরের তদারকী করতে করতে অসুস্থ হয়ে যান। ঐ থিসিসে আরো বলা হয় চট্টগ্রামের অনেক অঞ্চল, যেমন কক্সবাজার, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী, পটিয়া, টেকনাফ ও পালং এলাকায় এবং দেশের অন্যান্য জেলায়

যেমন রংপুর, দিনাজপুর, মোগলহাট, বরিশালে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ শতশত বছর ধরে বসবাস করে আসছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে, পাকিস্তান আমলে এদের প্রত্যাবাসন করা হয়নি বলে ইতিহাসে প্রমাণ রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ঔপনিবেশিক শাসনামলে পৃথকভাবে বৃটিশের প্রশাসনাধীন না রেখে বৃটিশ-বার্মার হাতেই তুলে দেয়া হয়। ফলে শতশত বছর ধরে একসাথে, একই সংস্কৃতির ধারায় এবং একই সভ্যতার আওতায় বসবাসকারী ব্যাপক জনগোষ্ঠী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা একটি পরিবারকে দু'ভাগ করার মতই। বৃটিশের এই Divide and rule পলিসির ফলশ্রুতিতে নির্মম বিভক্তি দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ পরিবারের ভাই একদিকে বোন অন্যদিকে, চাচা একদিকে মামা আরেকদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উল্লিখিত এলাকায় এখনও ঐ প্রজন্মের অবস্থান রয়েছে। ও 'মলির চট্টগ্রাম গজেটিয়ার'-এর তথ্যমতে চট্টগ্রামে যারা ব্যাপকভাবে রোয়াই হিসেবে পরিচিত তারাই হল রোহিঙ্গা। উদ্বাস্তুরা চট্টগ্রামে আশ্রয় নেবার পেছনে প্রধানতম দুটি কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ ভৌগলিক দিক হতে চট্টগ্রাম আরাকানের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী। দ্বিতীয়তঃ চট্টগ্রামের সাথে ছিল আরাকানের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির বর্তমান ব্যাপকতা আরাকান থেকে একদিনের ফলশ্রুতি নয়। ১৯৫৭ সাল থেকে তা শুরু হয়। এম,এস,বাহারের গবেষণা কর্মের পরিসংখ্যান অনুসারে বিভিন্ন মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিরোধী নির্যাতনের ফলে বার্মা থেকে ২৫ বার রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। এই খেদাও অভিযান পরিচালিত হয় ১০৪৪, ১৪০৬, ১৫৪৪, ১৬৬০, ১৭৭৫, ১৭৮২, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৯৪, ১৭৯৬, ১৭৯৮, ১৭৯৯, ১৮১১, ১৯৩০, ১৯৩০, ১৯৩৮, ১৯৪২, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫৮, ১৯৬৭, ১৯৭৫, ১৯৭৮ ও ১৯৯১ সালে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাত দশক হতে বাংলাদেশে আরাকানী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে যায় যে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ধারণা করা হয় যে, কেবলমাত্র ১৭৯৮ হতে ১৮০০ সালের মধ্যে চট্টগ্রামে আগত উদ্বাস্তু দের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। লন্ডন থেকে প্রকাশিত Malcom John-এর Political

history of India সূত্রে জানা যায় যে, বর্মী বাহিনীর অত্যাচার ও নৃশংসতা এত মারাত্মক ছিল যে বাংলাদেশে আশ্রিত আরাকানী উদ্বাস্তুরা ঘোষণা করেছিল " আমরা আর আরাকানে ফিরে যাবনা, আপনারা যদি এখানে আমাদের হত্যা করেন, আমরা নিহত হতে রাজী, যদি আপনারা আমাদের তাড়িয়ে দেন আমরা বন্য পশুর বাসস্থান বনজঙ্গল ও বিশাল পাহাড়গুলোর মধ্যে আশ্রয় নেব।" ১৮২৬ ও ১৮৫২ সালে বৃটিশ দখলে যাওয়ার পর বেশ কিছু রোহিঙ্গা উপকূলীয় শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। ১৯৩০ ছিল রোহিঙ্গাদের জন্য একটি বিষাদময় দশক, এ সময়ে হিংসাত্মক দাঙ্গায় ২০০ মুসলমান নিহত হয় এবং অনেকেই বাংলাদেশে পালিয়ে চলে আসে। ১৯৪২ সালে বেশ কিছু রোহিঙ্গা দেশান্তরী হয়। কারণ তৎকালীণ সরকার ঐ সময়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে তাড়ানো এবং ভুমিহীন করার জন্যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। রোহিঙ্গারা পর্যায়ক্রমে আরও মারাত্মকভাবে সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, শোষণ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হয়।

১৯৬৫ সালের ২৯ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার(ঢাকা)- "Pakistan foreign policy relating to Burma" শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয় "এক সময়ে পূর্ব বাংলায় ৩০সহস্রাধিক আরাকানী উদ্বাস্তু ছিল........... আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে বর্মী সরকার আরাকানে বসবাসরত মুসলমানদের মনের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তাবেরধ সৃষ্টি করবে।" ১৯৫৯ সালের ১৭শে আগষ্ট "Pakistan times" (ঢাকা)–এ তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্ণর জাকির হোসেনের একটি বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়- 'The Burmese Government is agreeable to take back their nationals which had entered Pakistan as refugees' ঐ দিন সকালে গভর্ণর জাকির হোসেন কক্সবাজার থেকে ফিরে পতেঙ্গা বিমান বন্দরে এই তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯৬৯ সালের ১৪ই আগষ্ট মর্ণিং নিউজে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় যে প্রাদেশিক সরকারের এক আদমশুমারী অনুযায়ী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ৩০৯০ পরিবারের ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬শত ৬২ জন উদ্বাস্তুর বসবাস ছিল। আকিয়াবে তৎকালীন পাকিস্তানের ভাইস কনস্যুলার কায়সার রশীদের বক্তব্য অনুযায়ী এই সংখ্যা আরো বেশী বলে জানা যায়। কিন্তু প্রত্যাবাসন বিফলে যায়। বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক এ.এন. এম হাবিবুল্লাহর 'রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস' গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় যে, ১৯৭৮সালে নির্যাতনের

নগ্ন প্রকাশ ঘটে। ১০ সহস্রাধিক লোককে এসময় নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ফলে প্রায় ৩ লক্ষ লোক আমাদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালেও সেই নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এখনও প্রায় ২০ হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এই পরিসংখ্যান শুধু নিবন্ধনকৃত রোহিঙ্গাদের। একটি সূত্রে জানা যায় উখিয়া টেকনাফ সীমান্তে নিবন্ধিত হয়নি এমন অনেক রোহিঙ্গা মানবেতর জীবন যাপন করছে। বর্মী বাহিনী এখন সীমান্তবর্তী বাঙ্গালী কাঠুরিয়া ও সাধারণ জনগণকে হত্যা করছে। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে সীমান্ত এলাকায় শত-সহস্র মাইন বসিয়েছে। মাইন বিস্ফোরণে বাঙ্গালী ও রোহিঙ্গা হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। পূর্বোক্ত তথ্য অনুযায়ী দফায় দফায় উদ্বাস্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিলেও শুধু ১৯৭৮ ও ১৯৯১ সাল ছাড়া বর্মী সরকার উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসনে কোন প্রকার আন্তরিকতা দেখায়নি। আরও মজার বিষয় এই যে, ১৯৭৮ ও ১৯৯১ সালে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত যে চুক্তি হয় তাতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদেরকে 'বাংলাদেশী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে বা যাবতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ অনুসারে মগ, রোহিঙ্গা মুসলমান, রোহিঙ্গা হিন্দুরাই হল আরাকানের বৈধ নাগরিক। বর্মী জাতিরাই হচ্ছে সে দেশে বহিরাগত এবং অবৈধ। অথচ তারাই শুধু রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে ভিনদেশী বলে আখ্যায়িত করছে। কিন্তু কেন? এই মনোভাব নিয়ে কি সমস্যা সমাধান করা সম্ভব? বার্মা যদি এই সমস্যা সমাধানকল্পে এগিয়ে না আসে এবং আমরাও যদি রাজনৈতিক সমাধানে এগিয়ে না যাই তাহলে এটি আমাদেরই পরাজয়।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যাটি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। সুতরাং রাজনৈতিকভাবে এটি সমাধানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়া ওয়াচ কর্তৃক ১৯৯৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক রিপোর্টে বর্তমান বর্মী সামরিক জান্তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেঃ জেনারেল মিয়াথিনের একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়। লেঃ জেঃ মিয়াথিন বলেন, 'The Muslim population of Rakhine state(Arakan) were not recongnized as citixens of Myanmar under the existion naturalization regulation and they were not even registered as so called foreign residents. Their status situation did not permit them to travel in the country'. অপরদিকে ১৯৯২ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয়

কমিশনারের কার্যালয় থেকে 'Operation hope' শিরোনামে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, 'By history be tradition, by culture and by civilisation the Rohingyas are as much citixens of Myanmar as any one else in that country' রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার নিয়ে বাংলাদেশ ও বার্মার মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ সমস্যা সমাধানে একটি প্রধানতম অন্তরায়। অথচ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের অনুগামী। কিন্তু বিগত সরকার তাদের এই অবস্থার অক্ষুন্ন রাখতে পারেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা দ্বৈত নীতি গ্রহণ করে এবং এক পর্যায়ে বিগত সরকার এমন হঠকারী পদক্ষেপ নেয় যা বর্মী সামরিক জান্তার উদ্দেশ্যকেই সফল করেছে। সরকারের দুর্বলতম দিক বুঝতে পেরে তারা সমস্যাটিকে আরো গভীর সমস্যার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ১৯৭৫সালে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ***"কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কঠোরভাবে বার্মায় সতর্ক বার্তা পাঠান। তিনি বার্তায় এ ধরণের মুসলমান খেদাও অভিযান থেকে বিরত থাকতে বলেন নয়তো পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন।"*** বর্তমান সরকার এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবে- এটাই সবার প্রত্যাশা। আমাদের সামনে চাকমা ইস্যুর দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, চাকমা উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে যেভাবে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসৃত হয়েছে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে ঠিক তা দ্বিগুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু নিয়ে কোন বৈঠক হলে প্রতিপক্ষে উপজাতির প্রতিনিধি থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ ও বার্মার চুক্তিতে কি ছিল? বাংলাদেশ ও বার্মার মধ্যে বৈঠকের সময় কারণ রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি তাদের বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো ও যৌক্তিকভাবে যে উপস্থাপন করবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এশিয়া ওয়াচে ৩৬ পৃষ্ঠার উপসংহারে, জাতিসংঘের প্রতিবেদনে এবং এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্মা এ্যাফেয়ার্স এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয় যে, ১৯৮২ সালে বৈষম্যমূলক নাগরিক আইন অবিলম্বে বাতিল করা এবং সাংবিধানিকভাবে নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে না বলে তারা উল্লেখ করেন। আমাদেরও কি সেই সত্য উপলব্ধি করা উচিত নয়? কিন্তু আমরা কেন সেদিকে মনোনিবেশ করছি না? (দা'ওয়াত রিপোর্টার)

কেন এই নির্যাতন

কি অপরাধ রোহিঙ্গা মুসলমানদের? কেন সাম্প্রদায়িক বর্মী সামরিক জান্তা তাদের উপর চালাচ্ছে অমানবিক নির্যাতন? কেন তাদেরকে আজ অত্যাচারের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে? কেন তারা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত? অথচ তারা বারশত বছর ধরে তাদের মাতৃভূমি আরাকানে বসবাস করে আসছে। তাদের অপরাধ আর কিছু নয়, তারা হলো রোহিঙ্গা মুসলমান। চেহারা-সুরতে তারা বাঙ্গালীদের ন্যায়। তারা ধারণ করেছে ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্য। বাঁচতে চায়, পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে, রোহিঙ্গারা চায় জুলুমের চীর অবসান ঘটিয়ে দুনিয়ার বুকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়াতে। ফিলিস্তিন, বসনিয়া আর কাশ্মীরের মুসলিম নিধন অভিযান থেকে আরাকান রোহিঙ্গা মুসলিম নিধন অভিযান বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়। ইহুদী, সার্ব, ক্রোট আর বর্মী জান্তা সকল 'কুফর' একই জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

আরাকান রোহিঙ্গা মানবাধিকার এবং নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ

আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমান সমস্যা যুগ যুগ ধরে অমীমাংসিত এবং মর্মন্তুদ সমস্যা। কিন্তু যুগ যুগ ধরেই এটিকে অবহেলা এবং উপেক্ষণীয় ইস্যু হিসেবে দেখা হয়েছে। ইস্যুটির গায়ে বিভিন্ন রং চড়িয়ে ধামাচাপা দেয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে এবং এদিকে যাতে দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ইস্যু টিকে বিভিন্ন চক্রান্তের ফাঁদেও ফেলা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ মাইনুল আহসান খানের ভাষায়, "আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন নিয়ে যতটা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক কম শংকিত হয়েছি আরাকানের মুসলিম নিধন নিয়ে। ঠিক যেন নিজ ঘরের কাজের মানুষটিকে অবহেলা করে অন্যের ঘরের বউয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার মত ব্যাপার।" তিনি তাঁর "মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন যে, "মানবাধিকার নিয়ে এত বেশী

রাজনীতি করেছি যে, আজ আমরা মানবাধিকারকেই বিপন্ন করে তুলছি। ফলে আমার বাড়ীর কাছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বলা বা চিন্তা করার সময় ও সুযোগ আমাদের হাতে নেই।"

পঞ্চদশ শতকে স্বাধীন আরাকানের গোড়াপত্তন হয়েছিল। আরাকানের পূর্ব নাম রোয়াং। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে আরাকান রাজ্য সাগর ও পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। আরাকানের সাথে বাংলাদেশের প্রায় ১৭১ মাইল জলসীমা রয়েছে। বিখ্যাত নাফ নদী হচ্ছে আরাকান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমারেখা। আরাকানের লোকসংখ্যা হচ্ছে ৪২ লক্ষ। যার শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে মুসলমান। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত আরাকান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল যা ১৮২৩ সাল থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনাধীন ছিল। উপমহাদেশে যখন বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় তখন আরাকানও এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে রোহিঙ্গা মুসলমানরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনে অংশগ্রহণ করে বলে ইতিহাসে বিপুল তথ্য রয়েছে। রোহিঙ্গাদের রয়েছে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। এই আরাকান থেকেই সাংস্কৃতিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন।

১০৪৪ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ২৫ বারেরও অধিক লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে এ অঞ্চলে তথা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। একটি দেশের হাজার হাজার নাগরিক আর একটি দেশে কখন পালিয়ে যায় তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। কারণ তা অনুমান করা যায়। কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি বর্মী সামরিক জান্তার পাশাপাশি মগদের(রাখাইন) চরম বৈষম্যমূলক আচরণ অনুমানকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রকৃত অর্থে বর্মীরাই আরাকানে বহিরাগত হলেও রোহিঙ্গা মুসলমানরা কোন প্রকার প্রশ্ন না তুলে স্থানীয় মগদের সাথে সম্প্রীতে বজায় রেখে সহাবস্থান করছিল। কিন্তু বর্মীদের পাতানো ফাঁদে পড়ে বর্মীদের পাশাপাশি মগরাও মুসলমানদের অস্তিত্বহীন করার জন্য সর্বাত্নক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এখন আরাকানে রাখাইনরা(মগ) নয় মুসলমানদেরকে বহিরাগত হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তদানিন্তন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে, তদান্তিন পূর্ব পাকিস্তান আমলে অধিকাংশ মগ সেখানে গিয়ে স্থায়ীভাবে

বসবাস করে। বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, মোগলহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থান থেকে মগরা দফায় দফায় আরাকানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে। এ ব্যাপারে তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও তথ্য-পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারা আরাকানে যাওয়ার পরপরই সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। এসব বহিরাগত মগ অনুপ্রবেশকারীদের অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত ছিল বলে তারা খুব দ্রুত রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে স্থান পায়। এতে বর্মী দখলদার চক্রটি সুযোগ পায় এবং তাদের শোষণের মাত্রাও বেড়ে যায়। মগ(রাখাইন) এবং দখলদার বর্মী উভয় চক্রটিই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বলে তারা একই পাত্রে অনেকটা দ্রবীভুত (Melting pot) হয়ে যাওয়ার মতো গাঁটছাড়া বাঁধে। মুসলমান রোহিঙ্গারা এই চক্রটির শোষণের শিকার হয়। মুসলমান রোহিঙ্গারা এই চক্রটির শোষণের শিকার হয়। ফলশ্রুতিতে প্রায় ৩০ লাখ মুসলমান বিশ্বব্যাপী অনিবন্ধিত ভাসমান শরণার্থীতে পরিণত হয় বলে গবেষণাধর্মী বিভিন্ন জরিপ সূত্রে জানা যায়। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে আরাকানে প্রশাসনের উচ্চপদে মুসলমান একেবারেই নেই। প্রতিরক্ষা বিভাগেও মুসলমান নেই। "এশিয়া ওয়াচ ", "এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল " ইত্যাদি মানবাধিকার রিপোর্টার আরাকানকে উম্মুক্ত বন্দী নির্যাতন কেন্দ্র (Open prison concerntration camp) হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

মুসলমানদের কাছে নাগরিক সনদপত্র না থাকায় তারা আরাকান থেকে তাদের নিকটবর্তী শহর আকিয়াবে যেতে হলেও সাতটি পয়েন্টে উৎকোচ দিতে হয় এবং বিভিন্ন সনদপত্র দেখাতে হয়। তারপরও চরম হয়রানীর শিকার হতে হয়। রাজধানী রেঙ্গুন যাওয়াও তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

১৯৯২ সালে রোহিঙ্গাদের একটি বৃহত্তম বহর দেশে আসার পর থেকে সে সমস্যাটি এখনও বলবৎ রয়েছে। সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানের কোন উদ্যোগ না নিয়ে যেভাবে শরণার্থী আসছে সেভাবেই চলে যাওয়ার শুধু তৎপরতা রয়েছে এটাকে যথার্থ প্রত্যাবাসন বলা যাবে না। অন্যদিকে আমাদের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি সমস্যা ছিল। সে প্রত্যাবাসন আর এই প্রত্যাবাসনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। রোহিঙ্গা প্রশ্নে উভয়পক্ষের মধ্যে ষাট বারের অধিক বৈঠক হলেও রোহিঙ্গাদের

নাগরিকত্ব প্রশ্নটি কি মীমাংসিত হয়েছে? না হয়নি। এখনও বার্মার সামরিক জান্তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বহিরাগত হিসাবে আখ্যায়িত করে। নাগরিকত্ব আইনের আওতায় আরাকানের প্রতিটি মগের (রাখাইন) কাছে লাল রঙের নাগরিকত্ব প্রত্যয়ন পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদেরকে এ প্রত্যয়ন পত্র দেয়া হয়নি। এ তথ্য সরকারের কাছে নিশ্চয় রয়েছে।

এদিকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের অধিকার আদায়ে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সংগঠন তৎপরতা চালিয়ে আসলেও তারা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। সুনির্দিষ্টভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ না থাকায় R,S,O, A,R,I,F ইত্যাদি নামে আন্দোলন করে। বিভিন্ন কারণের পাশাপাশি দখলদার বর্মী চক্রান্ত না বুঝে মগদের (রাখাইন) অসহযোগিতার কারণে তারা সাফল্য অর্জন থেকে অনেক দূর পিছিয়ে যায়। তবে এখন সে চিত্র পাল্টে গেছে। অতি সম্প্রতি (R,S,O)(A,R,I,F) তাদের নিজ নিজ সংগঠন বিলুপ্ত ঘোষণা করে A,R,N,O (আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক ফোরাম গঠন করে। A,R,N,O এর বিভিন্ন প্রকাশনার বক্তব্য অনুযায়ী প্রধান লক্ষ্যই হল আরাকানের প্রতিটি নাগরিকের আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বার্মার স্বাধীনতাও অর্জিত হয় এই চেতনার আলোকে। এই স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৯৪৮ সালে অং সান সুকীর পিতা জেনারেল অংসানের নেতৃত্বে। A,R,N,O (আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন) আরাকানের রাখাইন(মগ), বৌদ্ধ, মারমা, চাকমা,খুমি, হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বার্মার সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছে। স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বার্মা ইউনিয়নের ভিতরে থেকে স্বাধীন জাতি ও সত্য গণতন্ত্রী হিসাবে নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরাকানকে গড়ে তোলার জন্য মগদের (রাখাইন) প্রতি আহবান জানানো হয়। এতে রাখাইনদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, আরাকানে এ ধরনের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্দর পরিবেশ ছিল। A,R,N,O এর প্রকাশনায় বলা হয় যে, একটা সুদিন ছিল যখন মগ-মুসলমান একই ভিটায় থাকতো এবং একই পুকুরের পানি পান করতো।

তাই বলা হয়, বার্মা প্রজাতন্ত্র আমাদের সবার, আরাকান হচ্ছে আমাদেরই (Burma union is for all of us and Arakan is our own). কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বার্মা আরাকানকে দখল করার পরই এ সৌন্দর্য ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে চরম অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। তাই অতীতের ভুল বুঝাবুঝি ও আঘাতের অবসান ঘটিয়ে আরাকানে স্থিতিশীলতাও শান্তি নিশ্চিত করার কথা মগদের প্রতি আহবান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকাশনা সূত্রে জানা যায়। (As a true democrats, let us all unite in the building of a better and gtater Burma Union as the Free federation of free people enjoying the rights of self determination in their respective zones and united in the union of Burma for collective security, Democracy, Freedom and progress uphold the principles of peaceful co-existence and quail self-rule so as ensure stability, peace of progress in Arakan).

পরিশেষে একটি সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ মাইমুল আহসান খানের কিছু বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে এই নিবন্ধের ইতি টানতে চাই। গত ১৩ই আগষ্ট '৯৮ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ, সাবেক এটর্নি জেনারেল ব্যারিষ্টার কে. এস. নবী সহ দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডঃ মাইমুলের বক্তৃতার সমাপনী অংশের সারাংশই হল এই -আরাকানী মুসলমানদের সাথে আমাদের রয়েছে সহস্র বছরের বন্ধন ও ঐতিহ্য। এই বন্ধন বহুমাত্রিক। আমাদের নিজেদের স্বার্থে ও মানবতার স্বার্থে ও আমাদেরকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত। শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়; বরং মানবিক কারণেই অত্যন্ত জরুরী। নয়তো আমাদের মনুষ্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে। গ্লানি ও ধিক্কার বাড়বে। ইতিহাস প্রতিশোধ নিতে চাইবে। এই বক্তব্যের রেশ ধরে উল্লেখ করতে চাই রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে তাদের সুন্দর ঐতিহ্য ফিরিয়ে দেয়ার সময় এসেছে। এ ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতা অপরিহার্য। ((-- এন কামাল))

জিহাদ আরাকান সমস্যার একমাত্র সমাধান

আরাকানের ইতিহাস সামনে রাখলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর বর্মী আধিপত্য ঝেকে বসার পর থেকে তারা শুধু নির্যাতিত হয়নি দু'শত বছরের অধিক কাল ঐপনিবেশিক শাসনের কারণে রোহিঙ্গা মুসলমানগণ এতই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যে, তাদের নেতৃত্ব এবং নৈতিক ও বৈষয়িক শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ার কারণে তাদের মেধ্য এক প্রকার হীনমন্যতাবোধ জন্ম নিতে থাকে। এমনই এক অবস্থা থেকে রোহিঙ্গা জাতিকে উদ্ধারের জন্য বিগত দিনগুলোতে বার্মার আধিপত্ববাদী ও বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ ও বিদ্রোহ করার জন্য এবং নির্যাতনে অসহ্য হয়ে অনেক রোহিঙ্গা হিজরত করেন। এই হিজরতের করুন ফরিয়াদ ছিল; "হে শান্তিতে বসবাসরত মুসলমান ভায়েরা, তোমরা আমাদের বাচাও।" কিন্তু কে শোনে এই মজলুম মানবতার ফরিয়াদ?

অথচ মুসলমানদের উপর আল্লাহর নির্দেশ ছিল তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছো না? অথচ দুর্বল নারী-পুরুষ এবং শিশুরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে, হে প্রভু আমাদেরকে জালিমের এই বসতি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে অভিভাবক এবং সাহায্যকারী পাঠাও।

আমরা আল্লাহর কোরআনের বিশ্বাসী হয়ে ঐশী বাণীর হুকুম কি পালন করছি? কোথায় আমাদের মানবতা? মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন মুসলমানরা হলো এক শরীরের ন্যায়। শরীরের যে কোন জায়গায় আঘাত লাগলে সারা শরীরে তার ব্যথা অনুভব হয় আনুরূপভাবে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে মুসলমান নির্যাতিত হবে অপর মুসলমানকে তার ব্যাথায় ব্যাথিত হওয়াটাই হলো তার মুসলমানিত্বের দাবী।

আল হামদুলিল্লাহ! আফগান জিহাদ মুসলমানদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নতুন সবক দিয়ে গেল। আফগানিস্তানের পবিত্র জিহাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জিহাদ প্রিয় মুসলমানগণ মজলুমের সাহায্যার্থে ঝাপিয়ে পড়লো এবং প্রতিরোধ লড়াইয়ের চেতনাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়ে গোটা মুসলিম জাতির মনে শাহাদাতের পবিত্র নেশা পুনরায় জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে ময়দানে বের হয়ে আসেন একদল বিপ্লবী আলেম। আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন বিধান জিহাদের অপরিহার্য্য অনুভুতি পুনরায় উম্মতের হৃদয়ে জাগ্রত করার মানসে তারা অবতরণ করেন কঠিন সাধনার এক দিগন্ত বিস্তৃর্ণ প্রান্তরে। সেই সব মুজাহিদ আলেমদের শীর্ষ স্থানে ছিলেন হযরত মাওলানা এরশাদ আহমদ শহীদ (রহঃ) আব্দুস সামাদ ছায়্যাল। বাংলাদেশেরকৃতি সন্তান শহীদ মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী (রহঃ) এবং মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব। মাওলানা এরশাদ আহমদ সাহেবকে আমীর মনোনীত করে ১৯৮০ সালে পূর্ণ এখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব ইসলামী জিহাদী আন্দোলন। আফগান মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিযে আগ্রাসী দখলদার বাহিনী এবং দেশীয় কমিউনিষ্ট সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে আনসারের ভূমিকা নিয়ে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এই কাফেলার জানবাজ মুজাহিদগণ।

উক্ত জিহাদে বাংলাদেশের অসংখ্য আলেম, হাফেজ, শিক্ষক, ছাত্র, যুবক এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অশান্ত আফগানিস্তান স্বাধীন হতে না হতেই মুজাহিদগণ বিশ্বের অন্যান্য মজলুম দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থে এবং শাহাদাতী তামান্না নিয়ে ছুটে যান।

এদিকে অসহায়, নির্যাতিত মজলুম আরাকানী মুসলমানদেরকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে আফগান রণাঙ্গণে পরীক্ষিত মর্দে মুজাহিদগণ আরাকান উপত্যকায় মজলুম মুসলমানদের আজাদীর লক্ষ্যে জিহাদী ঝান্ডাকে উড্ডীন করেন। ১৯৮৯ সালে শহীদ মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকীর হাতে প্রতিষ্ঠিত জিহাদী কাফেলা আপন গতিতে এগিয়ে যায়।

রোহিঙ্গাদের এই সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশী ভাইদের করণীয়

কোন ইসলামী ভূখন্ডে শত্রুপক্ষের আগমণ ঘটলে প্রতিবেশী মুসলমানদের উপর কর্তব্য হচ্ছে এর প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া। অধিকৃত ভূখন্ডের যে যত নিকটে অবস্থান করবে, তার উপর এ দায়িত্ব তত তাড়াতাড়ি আসবে। কেননা, সকল ইসলামী জনপদ একটি নগরীর তুল্য। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ইমামদের অভিমত হচ্ছেঃ

আল্লামা আহমাদ ইবনে হাম্বলের অভিমত হচ্ছে ঃ এর প্রতিরোধে বেরিয়ে পড়তে পিতা-মাতার অনুমতি, কর্জদাতার অনুমতি ও সম্মতির কোন প্রয়োজন নেই, বরং এজাযত ব্যতীতই বেরিয়ে পড়তে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন হানেফী ফতোয়া বাণীতে উল্লেখ করেন ঃ

"যদি কুফুরী শক্তি কোন মুসলিম দেশের সীমা রেখায় আক্রমান করে অতঃপর ঐ এলাকার জনগণের উপর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে আইন। অনুরূপভাবে নিকটতম মুসলমানদের উপর ফরজে আইন। কিন্তু যদি মজলুম মুসলমানদের কিছু দূরে অবস্থিত মুসলমানগণ তাঁদের সাহায্য করা প্রয়োজন না হলেও জিহাদ ফরজে কেফায়া"।

আর যদি নির্যাতিত এলাকার মুসলমানগণ শত্রুর মোকাবেলা করার শক্তি না রাখে অথবা অলসতার কারণে জিহাদ না করে তখন পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে, যদি তারাও জিহাদ না করে এরপর তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর ফরজে আইন হবে। এরূপ যদি কেহ জিহাদের দিকে অগ্রসর না হয় পুরো দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া অন্যত্র বলেনঃ" মুসলমানদের উপর যদি কোন অমুসলিম শত্রু গোষ্ঠী আঘাত হানার ইচ্ছে করে, এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া সকলের উপর কর্তব্য। চাই তারা শত্রু গোষ্ঠীর টার্গেট হোক কিংবা না হোক"। (মাজমুয়া ফতওয়া খন্ড নং-১, পৃঃ ৩৫৮)।

চিন্তা করে দেখুন হে শান্তিতে বসবাসরত মুসলিম ভাইয়েরা। দুশমনের হীন অভিপ্রায় জানা মাত্রই যদি ঝাপিয়ে পড়া কর্তব্য হয়, তবে যখন একের পর এক মুসলিম নারীগণ নরপশু মগদের কবলে, আরাকানের পবিত্র মসজিদগুলো আজ নাসাকা বাহিনীর মদের আড্ডা খানায় পরিণত, মুসলমানদের শ্রদ্ধার পাত্র মাদ্রাসার শিক্ষকদের দুধের মত দাড়িগুলো কর্তন করে ফেলা হচ্ছে তাদের যুবতী মেয়েদেরকে সৈন্যদের হাতে সোপর্দ না করার কারণে তাবলিগের মারকাজ আজ তালাবদ্ধ, কিছুদিন যেতে না যেতে মজলুম আরাকানরা উদ্বাস্তুর বেশে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে, তখন বসে থাকার কোন সুযোগ আছে কি? নবী করিম (সাঃ) নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছে, আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য সরকারের সৈন্য বাহিনীভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, নিয়মিত বাহিনীর লোক না হলেও এগিয়ে আসা কর্তব্য।

ইমাম কুরতবী মত প্রকাশ করেনঃ" ইসলামের শত্রুদের অপতৎপরতায় বিপদগ্রস্থ মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা জানা মাত্রই তাদের সাহায্যার্থে সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে আসা ও যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়া সকলের উপর কর্তব্য"। ইমাম কুরতবীর মতামতে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

এই মুহূর্তে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ুন

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত রেখায় মানবতার অগ্নি পরীক্ষা চলছে। প্রতিদিন চলছে। প্রতিদিন আসছে ওরা। ঐতিহ্যবাহী স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্য আরাকানের রোহিঙ্গা বংশোদ্ভুত উম্মতে মোহাম্মদীর বিশাল পরিবারটি এখন চরম ভাবে পর্যুদস্ত।

সমাজতান্ত্রিক পশু, সামরিক হার্মাদ আর হিংস্র মগ সম্প্রদায়ের সমূহ আক্রমনে ওরা ওষ্ঠাগত প্রাণ। বাড়ী ঘর, বাস্ত ভিটে ফেলে রেখে ওরা পালিয়ে আসছে বাংলাদেশে। দুধের বাচ্ছা বুকে চেপে ধরে ছুটে আসছে পাগলিনী রোহিঙ্গা মায়ের দল। মূল্যবান সম্ভ্রম হাত ছাড়া করে প্রাণভয়ে ছুটে আসছে কিশোরী ও যুবতীরা। নিপীড়নের বিষাদমাখা স্মৃতি নিয়ে আসছে যুবক বৃদ্ধ ও শিশুদের কাফেলা খাদ্য নেই, ঔষধ নেই, নেই শীতবস্ত্র। বিলুপ্ত যেখানে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা।

হাজার হাজার বিপন্ন মানুষের অসহায় করুণ আর্তি; লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত আরাকানী মুসলমানদের আরশ কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস, পবিত্রতার আঁচলে কলংকের ছাপ নিয়ে ডুকরে উঠা রোহিঙ্গা কন্যার অশ্রুবন্যাও কি আমাদের ঘুমন্ত অনুভূতিকে জাগাতে পারে না? আমাদের ইসলামী চেতনা ও ঈমানী জোশ জয্বা কি এতই শীতল, নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে? আমাদের কি মনে নেই ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস? কুরআন- হাদীসের বাণীও কি আমরা ভুলে গেছি?

কাফের চক্রের হাতে একটি মাত্র মুসলমান বন্দী থাকলেও তো জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে একটি মাত্র মুসলিম মহিলার ইজ্জত লুণ্ঠিত হলেও তো বিশ্ব মুসলিমের উপর লড়াইয়ের দায়িত্ব এসে পড়ে। অন্ততঃ প্রতিবেশী মুসলমানদের উপর তো অবশ্যই জিহাদ অপরিহার্য্য হয়ে দাড়ায়।

কিন্তু আরাকান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশের তাওহীদী জনতার ভূমিকা এত অস্পষ্ট কেন? দেশের সরকার কী ভাবছে?

ইসলামী আন্দোলনের নেতারা নীরব কেন? কোথায় চীর সংগ্রামী আলেম সমাজ?

আল্লাহর পথে জীবন দেয়ার অপার্থিব নেশায় উম্মাতাল বাংলাদেশী যুবক তরুণ ও আপামর জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবী আলেম সমাজের প্রতি আমাদের এই দাবী এই মুহূর্তে বার্মার বিরুদ্ধে জিহাদরত মুজাহিদদের কাঁধে কাধ মিলিয়ে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ুন।

জুলুম থেকে পরিত্রানের জন্য নিজেদের অগ্রনী ভূমিকা রাখতে হবে

নিশ্চয় ঐ জাতীর ভাগ্যের পরিবর্তন আল্লাহ তায়ালা করেন না যতক্ষণ তারা সচেতন না হয়। (আল কোরআন)

আরাকানের ন্যায় বিশ্বের অনেক দেশেই মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে। একদিকে মুসলমান মার খাচ্ছে ,সাথে সাথে কাফেরদের দাতভাঙ্গা জবাবও দিচ্ছেন তার জ্বলন্ত প্রমান চেচনিয়া, কাশ্মির সহ বিভিন্ন মজলুম অঞ্চলে। কিন্তু আরাকানের বেলায় দেখা যায় এর ভিন্নতা। একদিকে চলছে আরাকানে অকল্পনীয় নির্যাতন, অন্যদিকে যারা জুলুমের শিকার হয়ে বাংলাদেশ হয়ে অন্য দেশে হিজরত করেছেন। তারা এরুপ বিলাসিতায় মগ্ন যে, তাদের দেখে মনেই হবে না তারা একটি নির্যাতিত জাতি। এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা নিজেদের অসহায়ত্বের কথা বলে বহির্বিশ্ব থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে। অনেকে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দিয়ে নিজ মাতৃভূমির কথা ভুলে আরব সাজছে। নিজেকে আরাকানী বা বাংলাদেশী পরিচয় দিতে ও লজ্জা বোধ করে। আরাকানের কিছু জ্ঞানপাপী আলেম রয়েছে যারা বাংলাদেশে আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করে বর্মী সরকার তথা জিহাদ বিদ্বেষীদের পক্ষে ওকালতী করে নিজেদের অবৈধ

জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত। তারা নাকি ফতোয়া দিচ্ছে এখনো আরাকানে জিহাদ ফরজ হয় নাই। অথচ ঐ ফতোয়াবাজ এবং মাতৃভূমিকে ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের অনেক আত্মীয়-স্বজন বর্মী সরকারের নির্যাতনে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অনেকে এমন ও আছেন যাদের মা,খালা ও বোনরা মাঝে মধ্যে তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন। এখানে অবস্থানরত ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের হাতে কিছু সাহায্য বা অর্থ দিয়ে তাদের হৃদয় বিদারক কান্নার বিণিময় দিলেন, এতে কি তারা বর্মী হানাদার সামরিক বাহিনীর ধর্ষণ, অবৈধ ট্যাক্স ,পারিশ্রমিক ছাড়া কুলি কাজে খাটানো এবং কষ্টার্জিত ফসলগুলো সরকারি দপ্তরে পৌঁছিয়ে দেয়ার মত বহুমুখী নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে? কখনও না। আপনাদের অনুভূতি আসা উচিৎ আপনার মা-বোনরা বর্মী সরকার কতৃক ধর্ষিতা হচ্ছে আর আপনারাএদেশে নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তায় কালাতিপাত করছেন। ধিক্কার দেই আপনার অর্থ সম্পদের উপর ,আপনার জ্ঞানচর্চার উপর। জেনে রাখুন ক্বিয়ামত দিবসে আপনার অর্থ, সম্মান, জ্ঞান কাল হয়ে দাঁড়াবে। আপনাদের চিন্তা করা উচিৎ ছিলো কি কারনে মাতৃভুমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এমুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান কি ছিলো? নবী করিম(সাঃ) মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে কি সেখানে আরামে অবস্থান করেছিলেন? কখনও নয়। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের উদ্দেশ্য ছিলো সর্বপরি প্রস্তুতি নেওয়া। যখন প্রস্তুতি সম্পুর্ন হয়েছে সাথে সাথে মক্কা বিজয়ের জন্য অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন। আর যখনই মুহাজিরগন তাদের নিজেদের মাতৃভুমির মুক্তির জন্য ঝাপিয়ে পড়েছেন তাদের কাধে কাধ মিলিয়ে আনছারগণও সর্বাত্বক সহযোগিতা করে মুক্তির জিহাদে শরীক হন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নুছরত আর সাহায্যের মাধ্যমে হারানো ঐতিহ্য ফিরে আসে। নবী আদর্শ-সাহাবা জীবনী আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত। তাদের পদাংক অনুসরণ করতে পারলে ইহকালীন শান্তি ও মজলুম মানবতা তথা আরাকানী জনগণের মুক্তি ফিরে আসবে। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন। আমীন ॥

আল-নূর পাবলিকেশন্স থেকে
প্রকাশিতব্য বই সমূহঃ

১। শান্তি ও মুক্তির পথ আল-জিহাদ
(২য় সংস্করন)

২। সেবক নয় রাক্ষস
(বর্ধিত কলে বরে ২য় সংস্করন)

৩। আল কোরানে জিহাদ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত বই সমূহঃ

১। মরনজয়ী মুজাহিদ
২। গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে(অপারেশান কাশ্মির)
৩। মুজাহিদের আজান
৪। জিহাদের চল্লিশ হাদীস
৫। "জিহাদ" সন্ত্রাস না রহমত
৬। লাহোর থেকে কান্দাহার
৭। ইসলাম ও জিহাদের প্রস্তুতি

মাসিক জাগো মুজাহিদ
ও মাসিক আদর্শ নারী

কি আপনি নিয়মিত পড়ছেন?
অতি সত্বর আপনার হকারের
কাছে খোঁজ করুন

প্রাপ্তিস্থান-
মীর পাবলিকেশনস্ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
মীর বুক ষ্টোর, হাট হাজারী, চট্টগ্রাম।

সমগ্র বিশ্বের অসহায় নির্যাতিত মজলুম মুসলমানদের মুক্তিকামী কাফেলার বলিষ্ঠ মুখপত্র- **মাসিক জাগো মুজাহিদ** ইসলামের সামগ্রিক গবেষণা, প্রচার-প্রসার এবং বর্তমান সমস্যার নিরিখে প্রতিটি পাঠকের সমীপে যুক্তিপূর্ণ বাস্তবধর্মী আলোচনা পৌঁছে দিতে জাগো মুজাহিদ অত্যন্ত তৎপর।

আসুন! আপনিও হোন

জাগো মুজাহিদ বিপ্লবের একজন গর্বিত সাহসী সৈনিক। অপর ভাইকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে জিহাদ ফি-ছাবিলিল্লায় সহযোগিতা করুন।

যোগাযোগ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

মাসিক জাগো মুজাহিদ

জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসা সংলগ্ন

লালখাঁন বাজার, চট্টগ্রাম

ফোনঃ ৬২১৪৩৪

সম্পাদক

মাসিক জাগো মুজাহিদ

বি/৩৮১, খিলগাঁও, তালতলা,

ঢাকা /১২১৯ ফোনঃ ৮৩৭২৬০